ষষ্ঠ অধ্যায়

বিদ্রোহের অগ্নিশলাকা, নারীর নতুন সম্ভাবনার শৈল্পিকভাস্য, নির্বাচিত ছোটগল্পের নিবিড় পাঠ।

আমি বিদ্রোহী রনক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত [নজরুল ইসলাম]

মহাশ্বেতার গল্পবিশ্ব পাঠ করলে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতার লাইন গুলি ঘুরে ফিরে বার বার চোখের সামনে ভাসতে থাকে। শুধু ছোটগল্প নয়, উপন্যাস, প্রবন্ধ, জীবনী, এমনকি সাময়িক সাক্ষাৎকার গুলি পাঠ করলেও আমরা মহাশ্বেতার সেই বিদ্রোহী মনোভাবের সঙ্গে পরিচিত হই। তাঁর গল্প পাঠ করলে অনায়াসে বোঝা যায় যে তাঁর গল্পের ভাবমুর্তি এবং বিদ্রোহের ভাষা এতটাই রুচি মার্জিত, শিল্পগত ও ঋজু ধর্মী শান দেওয়া কবিতার ঝাঁ চকচকে তপ্ত লৌহশোলাকার মতো উত্তপ্ত ভাষার চেয়েও অতিরিক্ত যদি কিছু থাকে তাই প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে মহাশ্বেতার গল্পে। ঢাল তরোয়াল হীন নিধিরাম সর্দারের মতো নিরাকার নির্বিকার রূপ মহাশ্বেতার ভাষাকল্পে অনুপস্থিত। বলা যায় তার নির্মিত নারী চরিত্ররা বিনা অস্ত্রেও বিপক্ষের আগ্নেয় অস্ত্রধারী বীর যোদ্ধার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সশরীরে লড়াই করার ক্ষমতা রাখে। এবং অনেক গল্পে সময়ের আবহে ধারাবাহিক ভাবে চলে আসা ছোটগল্পের প্রচলিত রীতিকে ফেটে চৌচির করে নির্দিষ্ট লক্ষে এগিয়ে চলে। নারী লেখিকার কলমে নারীর সহজাত বৈশিষ্ট্য গুলির কিছুটা হলেও ছাপ থেকে যায় তাঁর লেখার মধ্যে। কিন্তু মহাশ্বেতার লেখায় তার কোন চিহ্নই লক্ষ করা যায় না। প্রতিবাদের তীব্রতার কারণেই বোধয় মহাশ্বেতার লেখায় ফুটে ওঠে বল বীর্যবান পুরুষের পুরুষত্ব। বিখ্যাত প্রাবন্ধিক অমলেন্দু বসু একটি সাক্ষাৎকারে মহাশ্বেতার ভাষা ভঙ্গির দৃপ্তভঙ্গিমা করে বলেছেন,

> "যাই বল না কেন মেয়েরা লিখতে পারে না। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী মহাশ্বেতা দেবীর দৃষ্টান্ত দিলে তার উত্তর ছিল, মহাশ্বেতা আবার মেয়ে হল কবে। আমি তো পূজো সংখ্যা গুলো খুলে চার পাশে পুরুষ লেখিকাদের ভিরে ঐ একটা লেখকের দেখা পাই।" (ধীমান দাস গুপ্ত, ওঁ স্ব: স্বহা, এবং মুশায়েরা, শারদীয়, ১৪০৭, পৃ-১১)

নারী লেখিকার লেখায় থাকে সাধারণত ঘরের কাহিনি, ব্যক্তি জীবনের ও জগতের সুখ–দু:খ, গৃহস্থ পরিবারের জীবন বাস্তবতা আটপৌরে কথা। আর পুরুষ লেখকের লেখায় অমলেন্দু বসুর মতো অনেকেই আশা করেন সমাজের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক শ্রেণি বৈষম্য, শোষণ নির্যাতন, নারী ধর্ষণ, নারীর প্রতি অন্যায় অত্যাচার, নিপীড়ন, হত্যা, নারীকে শোষণ ও পশুত্বে পরিনত করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, আন্দোলন, সংঘাত এবং বিদ্রোহের বাস্তবতা উঠে আসে। যা মহাশ্বেতার লেখায় ও কথায় এবং আচরনে পরিপূর্ণভাবেই প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। ১৯৮৫ সালে শর্মিলা বসু মহাশ্বেতা দেবীর শ্রেষ্ঠ গল্পের সমালোচনায় লেখেন,

> "মেয়েদের ভাষা কোথাও কোথাও যে পুরুষের দীপ্তিমান ভঙ্গিকেও অনায়াসে অতিক্রম করে যেতে পারে তার স্বাক্ষর রয়েছে শ্রী মতি মহাশ্বেতা দেবীর রচনায়। ..... লেখিকাদের কলমে যে মেয়েলি জগৎ সেন্টিমেন্ট এবং নিজস্ব উচ্চারণের স্বাতন্ত্র্য মহাশ্বেতা কখনই তার অন্তর্গত নয়। স্বর্ণকুমারী দেবী থেকে আশাপূর্ণা দেবী পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য মেয়েদের যে বিশ্ব নির্মাণ, মহাশ্বেতা সেই পৃথিবীর মানুষ নন। তার শৈলী, তার নির্মোহ বাস্তব চেতনা কখনো কখনো পুরুষ লেখককেও, প্রতি তুলনায় আবেগি বলতে স্পর্ধা করতে পারে। সংহত জীবনায়নের এমন সুচারু প্রকাশ বাংলা সাহিত্যের জোলো

> আবহাওয়ায় বিরল।" (অরূপ কুমার দাস, সমাজ দ্বন্দ্ব ও বাংলা কথা সাহিত্য, পৃ- ১৫০)

সত্য কথাই বলেছেন শর্মিলা বসু। কেননা মহাশ্বেতার লেখায় প্রেম ভালোবাসার, রোম্যান্টিকতার, কল্পনা জগতের স্থান খুবই নগণ্য পরিবর্তে লক্ষ করা যায় কঠোর বাস্তবতার চরম সত্যতা, যা বাংলা সাহিত্যের জগতে কেউ এত বাস্তবতার মুখোমুখি দাড়িয়ে সত্য কথা বলার স্পর্ধা দেখাতে পারেন নি। যতটা মহাশ্বেতা নিজে তাঁর সাহিত্যে উল্লেখ করেছেন। মহাশ্বেতা নিজে তার সাহিত্য সম্পর্কে কি বলেছেন,

> " .....পুরুষের মতো লিখি? না। আমি আমিই। আমি আমার মতো লিখি। অন্য কোন ভাবে লিখতে পারিনা আমি। সাহিত্য চর্চা আমার কাছে নিরন্তর সুখপ্রদ ব্যাপার নয়। যন্ত্রণার, বেদনার, প্রশ্নের, আর্তির। আমার সম্পর্কে আমারই আরোপিত এই প্যাটার্নটিই চুড়ান্ত ও শেষ থাকুক এ যাত্রা। এ থেকে আমি মুক্তি চাই না।" (মহাশ্বেতা, ছোটগল্প, ভূমিকা, পৃ- ৯)

শোষণ, নির্যাতন, অবহেলা, অন্ত্যজ শ্রেণির দারিদ্র সীমারেখার নীচে বসবাসকারী মানুষকে ধ্বংস করা প্রভৃতি যে মহাশ্বেতার কাছে যন্ত্রণা–বেদনা–প্রশ্ন–আর্তির তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এবং সর্বোপরি এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও উত্তরণের মাধ্যম অনুসন্ধান প্রদান করাই তার সাহিত্য রচনার মূল উদ্দেশ্য হয়ে দেখা দেয়। তিনি প্রকৃত অর্থে দেশ ও দশের, সময় ও সমাজের প্রেক্ষিতে মানুষের বাস্তব অবস্থানকে চেতনায় ধারণ করে হয়ে উঠেন এক পীড়িত মানবপ্রেমী ব্যক্তি সত্তা। নিজেকে নিয়ে গেছেন সেই লাঞ্ছিত মানবাত্মার সন্ধানে। এখানেই মহাশ্বেতার সৃষ্টি স্বাতন্ত্র। মহাশ্বেতা নিজেকে নিয়ে গেছেন সেই লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, অবহেলিত, নৈরাশ্যপীড়িত, হতাশাদীর্ণ, সরকারী বেসরকারি সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত প্রান্তিকায়িত সম্প্রদায়ের কাছে হয়ে উঠেছেন কাছের

জন। নিজেই প্রত্যক্ষভাবে লড়তে থাকে সমাজের সংকীর্ণতা, সময়ের উত্থান পতনের সঙ্গেলেখনীর মাধ্যমে। আর এই লড়াইয়ের মধ্যেই নারী তার সমস্ত ব্যক্তি সত্তা নিয়ে সম্পূর্ণ রূপেই প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে মহাশ্বেতার ইতিহাস রচনার মধ্যদিয়ে, সমাজ বাস্তবতার মধ্যদিয়ে, সমাজের সংকট ও শোষিত শ্রেণির বর্ণনা ও প্রতিবাদের মধ্যদিয়ে।তিনি বঞ্চিত, অবহেলিত, শোষিত, পরাধীনতায় আবদ্ধ নারী মুক্তির কামনা করে যিনি বলেছেন,

> "মানবাধিকারের ব্যপারে মেয়েরা অনেক বেশি সচেতন। তারা সবাইকে সাহায্য করে। এক জায়গায় রান্না হচ্ছে, খাওয়াচ্ছে আবার প্রতিবাদও করছে। এসব দেখে ভবিষ্যৎ সম্পর্ককে নিশ্চয় আশা করতে পারি। যতই নিপীড়ন, নির্যাতন, বৈষম্য আসুক একদিন রুখে দাঁড়াবে তারা।" (দৈনিক যুগান্তর, ফেব্রুয়ারি- ২০০৯, সাক্ষাৎকার, বাংলা দেশ থেকে প্রকাশিত)

এই আত্মবিশ্বাসে বিশ্বাসী মহাশ্বেতা নিজস্ব প্রত্যয়ের গভীরে প্রবেশ করে নিজেই নিজের অজান্তে সমস্ত প্রচলিত ধারনার নির্দেশকে পেরিয়ে গেছেন নিজস্ব সৃষ্টি শীলতার মধ্যদিয়ে। এবং তৈরি করেছেন নিজস্ব স্রোতধারা। এই স্রোতধারার মধ্যদিয়ে নারীর অবস্থানকে সার্বিক মুক্তির স্বপ্নের সঙ্গে এক করে নিয়েছেন। চেয়েছেন নারীর বর্তমান অবস্থা, সমস্যা সংকট এবং সমাধানের বহুস্বরিক উন্মোচনের প্রয়াসে এক নতুন জগৎ তৈরি করতে। এই প্রত্যাশার কারনে মহাশ্বেতার সৃষ্ট নারী চরিত্র গুলি অত্যন্ত প্রতিকুল পরিস্থিতির মধ্যেও লড়াই করার ক্ষমতা রাখে। জীবন যাপনের কঠিন বাস্তব সমস্যার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে যুক্ত হয় এবং অন্যান্য সহায় সম্বল হীন বঞ্চিতদের জন্য সংগ্রামে সঙ্গ দেয়। প্রয়োজন হলে প্রত্যক্ষ বিদ্রোহে নেমে পরে।

মহাশ্বেতার সাহিত্য বিশ্বে গোরা থেকেই বিষয় হিসেবে আবর্তিত হয়েছে নারী। তাঁর প্রথম লেখা 'ঝাঁসিরানী' (১৯৫৬), তে এক ঐতিহাসিক নারীর অতুলনীয় প্রতিবাদী যুদ্ধকামী

রূপকে স্বীকৃতি দিতে চেয়েছেন। রাজ নর্তকী মতির সঙ্গে প্রাসাদের পাঠান ফৌজি সর্দার গুলাম ঘোষের তোপ খানার হাবিল দার খুদা বক্সের অতীন্দ্রিয় প্রেম নিয়ে রচনা করেন'নটী' (১৯৫৭)। যেখানে একজন নারী রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের সময় নিজের পরিবর্তিত ভূমিকাতেও সমান পারদর্শী হয়ে ওঠেন এবং নিজের জীবন বিপন্ন করে প্রেম কে বিসর্জন দিয়েছেন অথচ বিদ্রোহ অক্ষুণ্ণ রাখেন। জীবনের বিচিত্র দিক নিয়ে মিলে মিশে থাকা সার্কাস জীবন নিয়ে রচনা করেন 'প্রেমতারা' (১৯৫৯)। এখানে দেখানো হয় বয়স কালে প্রেম তারার শরীর ভেঙে যায়, খেলার সামর্থ ফুরিয়ে যায় এবং শেষে হয়ে যায় অন্ধকার ধোবা বস্তির নাগরিক। কিন্তু তার প্রতিবাদী হৃদয় অবশেষে তাকে তৈরি করে ঐ বস্তি সমাজের রানী হিসেবে। মদ জুয়ার আড্ডা থেকেই সে জীবিকা নির্বাহ করে। 'হাজার চুরাশির মা' (১৯৭৪) তে ব্রতী মৃত্যু ভয়কে উপেক্ষা করার ক্ষমতা রাখে, একজনের মা থেকে তিনি হয়ে ওঠেন বহু জনের মা। কোন ব্যক্তির প্রতি নয়, গোটা একটা সময়ের প্রতি তিনি মায়ের মতো দায়বদ্ধতা অনুভব করেছেন। ছোটগল্পেও এরকম বহু নারী চরিত্রের সম্ভার লক্ষ করা যায়। যারা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল, নিজস্ব মৃত্যুকে উপেক্ষা করে নিজের জীবনকেও করেছে নারীর প্রতি সামাজিক বিষয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মাধ্যম। উল্লেখ করতেই হয় 'বাঁয়েন', 'শনিচরী', 'দ্রৌপদী', 'সাঁঝ সকালের মা', 'স্তনদায়িনী', 'মায়ের মূর্তি', 'ইটের পরে ইট', 'হীরা মোতি', 'তেতরী কহানী', 'নেয় না' প্রভৃতি গল্পগুলিতে মহাশ্বেতা নারীর অগ্নিসম প্রতিবাদী রূপকেই উত্থাপন করেছেন।

মহাশ্বেতা অন্ত্যজ শ্রেণির আদিবাসী মানুষদের ভাষা, সংস্কৃতির, সুদীর্ঘ কালের রিক্ত, বঞ্চিত, শোষিত জীবনের সমব্যথী রূপকার। তাঁর কি উপন্যাস ! কি ছোটগল্প ! কি প্রবন্ধ ! নারী ভাবনা তার রচনায় বহু স্তরে পরিব্যাপ্ত, ব্যক্তি থেকে সমষ্টিতে বিস্তৃত। তবে তার সাহিত্যে অন্ত্যজ শ্রেণির জীবন প্রণালীর বর্ণনা এবং বিশ্লেষণের মধ্যে নারী এবং পুরুষের কর্মময় জীবনের মধ্যে কোন ভেদাভেদ লক্ষ করা যায় না। এ আসলে মহাশ্বেতার এক সম ভাবাপন্ন মানসিকতারই বহি: প্রকাশ। অর্থাৎ বঞ্চিত, অবহেলিত, নৈরাশ্য পীড়িত অদূর ভবিষ্যতের মধ্যেই তারা এক নতুন সম্ভাবনাময় নারী সমাজ গঠন করার পরিকল্পনারই অঙ্গ হয়ে ওঠে। যা তিনি শৈল্পিক তুলির টানে অতি সূক্ষ্ম অথচ স্পষ্ট ভাবে কাহিনি ও চরিত্র

বর্ণনার মধ্যদিয়ে তুলে ধরেছেন। নীচে কয়েকটি গল্পের নিবিড় পাঠের মধ্যদিয়ে নারীর নতুন সম্ভাবনার শৈল্পিক ভাষ্যকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

দ্রৌপদী

মহাশ্বেতার 'দ্রৌপদী' গল্পটি আমরা পূর্বেই পঞ্চম অধ্যায়ে একবার নিবিড় পাঠের নিরিখে আলোচনা করেছি ঐ অধ্যায়ের পরিপ্রেক্ষিতে। কিন্তু ষষ্ঠ অধ্যায়ের বিষয় বস্তুকে বিশ্লেষণ করার জন্যও এই গল্পটি আলোচনা করার বিশেষ অপেক্ষা রাখে। সে কারনেই এ অধ্যায়েও এর অন্তর্ভুক্তি আলোচনার দাবি রাখে।'দ্রৌপদী' গল্পের শুরু দ্রৌপদীর মৃত্যু অথবা অ্যানকাউন্টারের ঘোষণার মধ্যদিয়ে। দ্রৌপদী ও তার স্বামী দুলন দাওয়ালী কাজ করত, বিটুইন, বীরভূম, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, বাকুড়া রুটে ঘুরতো। ১৯৭১ সালে অপারেশন বাকুলিতে যখন তিনটি গ্রাম হেভিকর্ডন করে মেশিনগান করা হয় তখন দ্রৌপদী ও তার স্বামী নিহতের ভান করে পরে থাকে এবং এক সময় পালিয়ে যায়। পরে অ্যাপ্রিহেনশন অ্যাণ্ড এলিমিনেশন তত্ত্বে চাঙ্গা হয়। অর্জুন সিং দুর্ভেদ্য জঙ্গল সেনা দিয়ে চক্রব্যূহে ঘিরে ফেলে। দ্রৌপদীর স্বামী দুলন মাঝি ঝর্ণার জল খাচ্ছিল উপুর হয়ে শুয়ে তখন ৩০৩এর আঘাতে দুলনের শরীরটা নিশ্চল হয়ে পরে যায়। কিন্তু দুলন মরলেও আর্মি অপারেশন থামতে পারে না কারণ মহাজন, জোতদার, গোলদার, শুড়ি, বেশ্যালয়ের বেনামী মালিক, অতীতের খোঁচর এরা আজও স্বতন্ত্র। তাই দ্রৌপদীকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য সরকারী পুরস্কারের ঘোষণা। বাকুলিতে জোতদার সূর্য সাউ দ্রৌপদীদের হাতে খুন হয় এবং এটাই ছিল অপারেশন বাকুলির মূল উৎস। সেই সুবাদেই দ্রৌপদী ধরা পরে যায় পুলিশের হাতে। এবং এই রাষ্ট্র প্রশাসনিক সৈনিকদের হাতেই দ্রৌপদী ধর্ষিত হয়।

> "সন্ধ্যা ছটা সাতান্নতে দ্রৌপদী মেঝেন অ্যাপ্রিহেনডেড হয়। জেরা চলে। আটটা সাতান্নতে সেনানায়কের ডিনার টাইম হয় এবং দ্রৌপদীকে বানিয়ে আনতে বলে। রাত পেরোতে ঘোলাটে চাঁদের আলোয় দ্রৌপদী দেখে স্তন দুটি কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত, বৃন্ত ছিন্নভিন্ন। কতজন? চার–পাঁচ–ছয়–সাত

> তারপর দ্রৌপদীর হুশ ছিল না। জ্ঞান আসতে সে অনুভব করে যোনি দ্বারে রক্তস্রাব। দ্রৌপদী তার গায়ের ওপর ফেলে রাখা কাপড়টা দাঁত দিয়ে ছেড়ে এবং সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। বলে লে: কাউটার কর, লে কাউটার।”[১]

প্রশংসা করতেই হয় মহাশ্বেতার নিপুন নিখুঁত শিল্পিত করনের ভাষ্যকে। কেননা ধর্ষণের মতো বিষয়কে নিয়েই গল্পের ক্লাইম্যাক্স নির্মাণ। কিন্তু মহাশ্বেতা এখানে গল্পের মূল কাহিনীকে দ্রৌপদীর ধর্ষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি, তার থেকেও অধিক কিছু করার প্রয়াস দেখিয়েছেন। এবং তাতে তিনি পরিপূর্ণ সার্থক। আর এ প্রয়াস হল আত্ম নিগ্রহের মাধ্যমে প্রতিবাদ। তাঁর প্রতিবাদের ভাষাও উদ্যতঝা চকচকে তপ্তলৌহ শোলাকার ফলার মতো। অবশ্য এর প্রয়োজনও ছিল। কেননা নাট্যমঞ্চে অভিনয়কারী মহারাজার হাসি যদি অট্টহাসি না হয় তাহলে যেমন রাজার হাসি বলে মনে হয় না এবং প্রফুল্লতাও বজায় থাকে না। তেমনি প্রতিবাদের ভাষাকেও হতে হয় বর্শার তীক্ষ্ণ ফলার মতো। না হলে তার প্রতিবাদের প্রখরতাও প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে না। এবং শুধু ভাষায় নয়, ভাবে ও ব্যবহারেও প্রতিবাদ যেন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে মহাশ্বেতার ছোটগল্পের নারী চরিত্রদের মধ্যে। লোহাকে উত্তপ্ত আগুনে পোড়ালে যেমন লাল টকটকে রঙে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে দ্রৌপদীর প্রতিবাদও এমনই এক পূর্ণ অগ্নিপিণ্ডের রূপ নিয়ে হাজির হয় সেনা নায়কের সামনে,

> “দ্রৌপদী আরও কাছে আসে। কোমরে হাত রেখে দাঁড়ায়, হাসে ও বলে, তুর সাধানের মানুষ, দ্রৌপদী মেঝেন। বানিয়ে আনতে বল্যেছিলি, তা কেমন বানিয়েছে দেখবি না?
>
> .....
>
> দ্রৌপদীর কালো শরীর আরও কাছে আসে। দ্রৌপদী দুর্বোধ্য সেনা নায়কের কাছে একেবারে দুর্বোধ্য এক অদম্য হাসিতে কাঁপে। হাসতে গিয়ে ওর বিক্ষত ঠোট থেকে রক্ত ঝরে এবং

> সে রক্ত হাতের চেটোতে মুছে ফেলে দ্রৌপদী কুলকুলি দেওয়ার মতো ভীষণ, আকাশ চেরা, তীক্ষ্ণ গলায় বলে, কাপড় কি হবে, কাপড়? নেংটা করতে পারিস, কাপড় পরাবি কেমন করে? মরদ তু?
>
> চার দিকে চেয়ে দ্রৌপদী রক্ত মাখা থুথু ফেলতে সেনা নায়কের সাদা বুশ সার্টটি বেঁছে নেয় এবং সেখানে থু থু ফেলে বলে, হেথা কেউ পুরুষ নাই যে লাজ করব। ..... দ্রৌপদী দুই মর্দিত স্তনে সেনা নায়ককে ঠেলতে থাকে এবং এই প্রথম সেনা নায়ক নিরস্ত্র তার্গেটের সামনে দাঁড়াতে ভয় পান, ভীষণ ভয়।”[২]

এক অসহায় উলঙ্গ নারীর দেহও যে প্রতিবাদের এত বড় হাতিয়ার হতে পারে তা মহাশ্বেতার ‘দ্রৌপদী’ গল্পের দ্রৌপদী মেঝেন দেখিয়ে দিয়েছেন। আর সময়কে কীভাবে গল্পের মধ্যে জীবিত করে রাখতে হয়, মহাশ্বেতার গল্প তার বাস্তব প্রমান। বলতেই হয় এই গল্পে শুধুমাত্র প্রশাসনিক রাষ্ট্র শক্তিকেই অপমানিত ও ঘৃণা করেননি দ্রৌপদী। পাশাপাশি পুরুষ শক্তিকেও হেয় করে দিয়েছে। এবং এর মধ্যদিয়ে প্রমান হয় না যে নারীরাও পারে প্রতিবাদ, আন্দোলন, সংঘাত, বিদ্রোহীনি রূপ নিয়ে আবির্ভুত হতে। এ আসলে নারীর এক নতুন সম্ভাবনাময় প্রস্তুতিরই শৈল্পিক ভাষ্য এই গল্প। যা আগামী দিনে এক সুন্দর ও সুশ্রী পরিবেশ গঠন করার প্রয়াস। দ্রৌপদী সে স্বপ্নই দেখেছে, দ্রৌপদী ধরা পরার ভেতর মানুষের সংগ্রাম শেষ হয় না। মৃত্যুও ঘটে না সংগ্রামী চেতনার। বরং বলা যায় ক্রমাগত বেড়েই চলে। তাই বোধয় দ্রৌপদীর স্মৃতিতে অরিজিতের নির্দেশ জাগে,

> “যখন জিতছ, তা যেমন জানবে, যখন হারলে তা মানবে এবং পরের স্টেজ থেকে কাজ করবে।”[৩]

হেরে যাওয়াটা শেষ কথা নয়, তা দীর্ঘ পথের এক সময়ের অভিজ্ঞতা মাত্র। কেননা যে সংগ্রাম একবার শুরু হয় সে সংগ্রাম অত সহজে আর থামে না, যদি না তাদের আন্দোলনের হেতু পুরণ হয়। তাই তো একটার পর একটা মঞ্চ তৈরি হয় আন্দোলনের, বিদ্রোহের নতুন নতুন মাত্রা ও নতুন নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে। লেখিকা নিজেও সর্বোহারা মানুষদের পরবর্তী চেতনার কথাই জানিয়েছেন গল্পে,

> "নিরন্ন নেংটেরা আজও উদ্যত ও অনমনীয়।.....বাইরের কেতাবি শিক্ষা ও অন্তরের উদ্যম এইমাত্র যাদের সম্বল তাদের গুলি করে নিকেশ করা চলে, হাতে কলমে কাজ করছে যারা তারা অত সহজে নিকাশ হবার নয়।"[৪]

আর এ কারনেই মহাশ্বেতা দেবীর দ্রৌপদী মেঝেনের কাহিনি সাতের দশক ছাড়িয়ে এগিয়ে নিয়ে যায় আগামী দিনের স্বপ্নের কুড়ি গুলিকে।

‘নেয় না’

প্রকাশ :- পরিবর্তন শারদীয়, ১৩৯২ / ১৯৮৫ খ্রি:

‘নেয় না’ গল্পেও মহাশ্বেতা দেবী অতসী ও বটার প্রেম কাহিনির মধ্যদিয়ে অতসীর জীবনের সঙ্গে সমাজের ধর্মীয় বিধি বিধান ও শ্রেণিগত বৈষম্যের দিকটিকে তুলে ধরেছেন। সাংস্কৃতিক রাজনীতির গ্যাঁড়াকলে নারীরা যে কতটা বিপন্ন, হেয় ও শাসিত এবং শোষিত হয় এই বিষয়টি অতসী ও তার মায়ের মধ্যদিয়ে ফুটে ওঠে।

গল্পে অতসী এক উচ্চ ব্রাহ্মন পরিবারের সন্তান। উচ্চ ব্রাহ্মন শ্রেণির মানুষ হলেও পারিবারিক অবস্থার দিক থেকে অতি দরিদ্রতার মধ্যদিয়ে জীবন যাপন করে। অতসী বাইরের কোথাও কোন কাজে যেতে পারে না উচ্চ ভদ্র ব্রাহ্মন ঘরের সন্তান হওয়ায়,আবার পারিবারিক অভাব অনটনের কারণে নীরবে থাকতেও পারে না। অতসীর প্রতিবাদী মন তাই তো বলে, ‘ভদ্র ঘরে জন্ম নেবার মুখে তিন ঝাড়ু মার।’ ঘরে বসে নীরবে কাগজের ঠোঙা বানায় বোটা বিক্রি করে টাকা এনে দেয় অতসীকে। অতসীর প্রতি বটার প্রেম ভালোবাসার কোন স্বার্থ নেই, নিঃস্বার্থ ভালো বাসা বটার। বটা জানে সে অতসীকে কোন দিন বিয়ে করতে পারবে না। আবার পালিয়েও নিয়ে যেতে পারবে না, কারণ অতসীরা ব্রাহ্মন। আর ব্রাহ্মনরা ভগবান তুল্য, তাদের শ্রদ্ধা করা যায়, প্রনাম করা যায় কিন্তু তাদের পাওয়া যায় না, ছোঁয়া যায় না, বিয়ে করা যায় না। তাদের দিকে হাত বাড়ানো যায় না, পাপ হয়। তাইতো অতসীর এবং বটার প্রেম সমাজ কখনো একত্রিত হতে দেবে না।

সামাজিক বিধি নিষেধের প্রভাব এতটাই প্রখর যে পুরুষরা শত অন্যায় এবং অত্যাচার করলেও নারীদের নীরবেই সহ্য করতে হয় সমস্ত অন্যায়কে। সে অত্যাচারের মাত্রা যতটাই হোকনা কেন। অতসীর মার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে,

> "অতসীর সতী লক্ষ্মী মা, স্বামীর লাথিতে কোমর ভেঙে বহুকাল অষ্টাবক্র। দেখানোও হয়নি, ঐ ভাবেই কোমর বেকে আছে। তবুও সতী লক্ষ্মী। কেননা কাঁকাল ভেঙেছে বলে তোমার ছেলে পেটে ধরবো না, এমন কথা ও ভাবেও নি, বলেও নি।"[৫]

মহাশ্বেতা অতসীর মায়ের কোমর ভাঙার মধ্যদিয়ে শুধুমাত্র ব্রাহ্মন সমাজের নারীদেরই নয়, গোটা বাঙালি সমাজেরই নারীর মূল অবস্থানটিকে তুলে ধরেছেন। কেননা বাস্তবিক অর্থে স্বামীর লাথি, ঘুষি, চোড় – থাপ্পর খেলেও যদি চুপ করে থাকে তবেই সে সতী লক্ষ্মী আর প্রতিবাদ করলে অসতী এবং ডাইনী। এর বিপরীতটা হতে দেখা যায় না। কেননা সমাজ তাদের এভাবেই শিখিয়েছে। আর তাইতো নীরবে সহ্য করার ক্ষমতা টুকু স্বাভাবিক ভাবেই তৈরি হয়ে যায়। তবে অতসী এই সমসাময়িক সময়েও নাতো তার মায়ের মতো। না তো সে সমাজের মনমতো ধর্মকে, আভিজাত্যকে তোয়াক্কা করে। অতসী সাপের মতো ফণা তুলে তার মাকে বলে,

> "খেতে যে পায় না, খাটলে তার ইজ্জত যায় না। অন্য জাতের যখন যায় না বামনেরও যায় না।"[৬]

অতসী বোঝাতে চেয়েছে যে জাত পাত, ধর্ম, উচ্চ নিচু, ব্রাহ্মন কায়স্থ প্রভৃতি ভেদাভেদের চেয়েও অনেক বড় জীবন পালনের ধর্ম। কিন্তু এই সত্যটুকু বোঝাতে অতসী ব্যর্থ হয়। থানার দারোগা ও ক্ষুদিরাম অতসীর রূপ যৌবন দেখে আপসোস করে। তাকে পটিয়ে নেবার জন্য অতসীর বাবার সঙ্গে কথা বলে। কিন্তু অতসীরা নিজেকে বাঁচিয়ে

রাখতে পারে। তার মাও পেরেছে। তাইতো অতসীর মা সগর্বে গৌরবে সব ভুলে গিয়ে নিজের সতীত্ব সম্পর্কে বলে,

> "চৌদ্দ বছরে বিয়ে, চল্লিশ বছর হয়ে গেল বয়স, কেউ বলতে পারবে না যে কখনও পর পুরুষের দিকে চেয়েছি।
>
> এমন কথা বলতে বামনেরও সাধ যায়। কিন্তু বলতে পারে না। কেননা শিবির মা মেছনি সেদিনই তাকে ঘাটের মরার রস কত, বলে গাল পেরেছে।"[৭]

বলতেই হয় অতসীর মা নিজের যতটা সতীত্ব বজায় রাখার তাগিদ তার বাবা কিন্তু পুরুষ বলে তার কোন দায় নেই। অথচ অতসীর মার সত্যি কথা বলার মতো ক্ষমতা নেই কারণ অতসীর বাবা পুরুষ এবং স্বামী। এভাবেই দমিয়ে রাখা হয় নারী সমাজকে। অতসী কিন্তু তার মায়ের মতো নয়। অর্থাৎ দুটি প্রজন্মের মধ্যেই এক অদ্ভুত পার্থক্য তৈরি হয়ে গেছে উভয়ের মধ্যে। অতসীর মা নীরবে মুখ বুজে ছিল, যা করতে পারেনি অতসী তাই করেছিল। প্রতি পদে পদে অতসী প্রতিবাদ করে গেছে।তার নিজের প্রেমিক বটাকেও কটু কথা বলতে পিছু পা হয় নি।, 'বিয়ে করলে করবি বটা নইলে ভালো বাসার কথা মুখে আনবি না। ভীতু কোথাকার !'[৮]

নীরবে পাড়া প্রতিবেশিকে না জানিয়ে কুলিন ব্রাহ্মনের সঙ্গে অতসীর বিয়ে দেয় বিনা পনে। দীর্ঘ নি:শ্বাস ফেলে অতসীর বাবা বাড়ি থেকে শনি বিদায় করেছে বলে। কিন্তু অতসী বুঝতে পারে ঠক, মাতাল স্বামীর পরিকল্পনা, জোচ্চোর শাশুড়ির মনের ভাবনা ও প্রলাপ। তাইতো সমস্ত কলঙ্ককে তুচ্ছ করে স্বামী, শাশুড়ি, স্বামীর ঘর ছেড়ে বিয়ের পরের রাতেই রাতের অন্ধকারে পালিয়ে আসে বাড়িতে। এবং আসার সময় তল পেটে বেঁধে নিয়ে আসে নিজের বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়া সমস্ত অলঙ্কার। অতসী জেনেছে তার বিপদের দিনে এগুলোই হবে তার হাড় জিরানো সম্বল। তারপর কয়েকদিন নতুন স্ত্রীকে ভোগ করে

কলঙ্কিনী নারী বলে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। অতসীকে বিয়ের আগে তার স্বামী আরও তিনটি বিয়ে করেছে এবং তিনজনকেই কলঙ্কিনী করে ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু অতসী সে সুযোগ দেয়নি সে নিজেই স্বামীকে ছেড়ে দিয়ে, না জানিয়ে পালিয়ে এসেছে।

মহাশ্বেতা বোধহয় অতসীর মধ্যদিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন, সমাজের নারীর দুর্গতির মাত্রাগুলি কীকী এবং কেমন হতে পারে। কেননা বাস্তব সমাজেও এমন বহু নারী রয়েছে যারা সমাজে কলঙ্কিত হয়েছে এবং স্বামী ত্যাগ করেছে স্ত্রী কে। আবার এই ধরনের নারীদের নিয়ে নিজস্ব বাড়িতে সমস্যা সৃষ্টি হয়। কেননা সমাজ, পারাপড়সি জানলে বাবার নাক কেটে যাবে যে! উভয়ই সঙ্কট এই সমাজে নারীদের, তারা পারে না নিজের স্বামীর কাছে ঠাই, পারে না পিতার কাছে, আবার পারে না সমাজের কাছে। তাইতো এই সামাজিক কারনেই বহু নারীকেই হতে হয় দেশান্তরি এবং আত্মঘাতি। অতসীর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। অতসীর বাড়ির লোকেরা সমস্তকিছু জানার পরেও বলে,-

"এর চেয়ে তুই মরলি না কেন?

অতসী চেয়ে থাকে।

মরলে জানতাম মরে গেছিস।

এখন লোককে কি বলব!

তারা চরিত্তিরের দোষ দিলে বা কী বলব!

অতসীর মুখে দুর্বোধ্য হাসি খেলা করে।

তার চে, আমি ফিরে যাই, কি বল? যেয়ে দেখি,

ওরা কদিনে তাড়ায়, তখন নয় চলে আসব।

তাই বলেছি?

> আহা, তখন তোমাদের লোকের কাছে বলার মুখ থাকবে। এখন তো লজ্জায় বংশ ডুবে যাচ্ছে। তারা তাড়ায়, বৌ আসে 'নেয় না' হয়ে থাকে, যার যা কপাল বলে কাটানো যায়। কিন্তু তদ্দিন অপেক্ষা না করে বৌ চলে এলে সত্যিই তো তোমাদের লজ্জায় ফেলা হয়।
>
> অতসীর মা বলে, নিশ্চয়! এ না হলে আর শোলক থাকত না, 'মেয়ের নাম ফেলি/যমকে দিলেও গেলি/জামাইকে দিলেও গেলি!' এই যে আমি! লাথি খেয়েছি কোমড় ভেঙেছি .....।"[৯]

অতসী বুঝতে পেরেছে সমাজের আসল রূপ। তাইতো দিনটুকু ছলাকলা করে কাটিয়ে দিয়ে বটাকে সঙ্গে নিয়ে সে পালিয়ে যায় কলকাতার উদ্দেশ্যে। বস্তুত মহাশ্বেতা অতসীর মাধ্যমে নারীর বাস্তবতা এবং প্রতিবাদের দিকটিকেই তুলে ধরেছেন। মহাশ্বেতার শৈল্পিক তুলির টানে শুধুমাত্র রোমান্টিক প্রেমের কাহিনি হয়েই থেমে যায় নি 'নেয় না' গল্পের কাহিনি। পাশাপাশি সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সাংস্কৃতিক রাজনীতির বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ ঘোষিত হয়েছে অতসীর আচার আচরন এবং সর্বোপরি তার সমাজ, উচ্চ শ্রেণির ভেদাভেদের বিরুদ্ধে। এখানে অতসী কেষ্ট পুর গ্রাম ছেড়েছে বটে পাশাপাশি সমাজের ব্রাহ্মণত্বের প্রতি যেন চুন কালি লাগিয়ে দিয়েছে। তৎসঙ্গে পাষণ্ড, পশুত্ব স্বামী ও ঠক জোচ্চোর শাশুড়ির লোভ লালসাকেও হেয় করে দিয়েছে। এবং এই নারী জাতি যে শাসন ও শোষণ হীন সমাজ গড়ে তুলবেই ধীরে ধীরে সে বার্তাও মহাশ্বেতা দেখিয়ে দিয়েছেন অতসীর মা এবং অতসী চরিত্রের পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে। কেননা যে অতসীর মা কোমর ভেঙে দেওয়ার সত্ত্বেও প্রতিবাদ হীন ভাবে স্বামীর ঘর করছে। তারই মেয়ে কোমর ভাঙাতো দুরের কথা প্ররোচনার কথা শোনা মাত্রই নিজেকে সে স্থান থেকে দূরে সড়িয়ে নিয়ে এসেছে। এবং অতসীর পরবর্তী প্রজন্ম যে আরও বেশি প্রখর, প্রতিবাদী, বিদ্রোহী এবং স্বাধীনপনা হবে এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই। এর পাশাপাশি সমস্ত নারী সমাজকে অতসীর

মতোই ভয়ঙ্কর প্রতিবাদী হওয়ার আ্বানই যেন মহাশ্বেতার এই গল্পের স্বরান্তরের মধ্যদিয়ে প্রকাশ করেছেন।

‘তেতরী কহানি’

প্রথম প্রকাশ : ‘অনুষ্টুপ’ শারদীয় ১৩৯৩ / ১৯৮৬ খ্রি:

‘তেতরি কহানি’ গল্পে মহাশ্বেতা দেবী চরিত্র গুচ্ছের কোন নাম করণ করেননি, ‘ক’, ‘খ’, ‘গ’ প্রভৃতি সংকেত চিহ্নের মধ্যদিয়ে চরিত্র নামের ব্যবহার করেন। এই প্রসঙ্গে মহাশ্বেতা নিজেও আক্রমনাত্মক ভঙ্গিতে আক্রান্ত করেছেন সম্পাদক, এবং চলচ্চিত্রের প্রডিউসার ও ডিরেক্টরকে। গল্পের শুরুতেই এই গল্পের চরিত্রদের নাম করণ ব্যবহারের কারণ জানিয়ে দেন,

> “এস ও এস/ভিক্টর একো পাপা কলিং/মে ডে, মে-ডে/বানদুং সন্মেলনের পথে যাত্রী ‘কাশ্মীর প্রিন্সেস’ বিমান যখন আকাশে অন্তর্ঘাতে ধ্বংস হয়, তা থেকে যে বিপন্ন জরুরি বার্তা রেডিও করা হচ্ছিল আমি সেই সিগনালই পাঠকদের কাছে রাখলাম কেন না প্রসঙ্গটি জরুরি।
>
> আপনারা এ গল্পে অ- আ-ক-খ বর্ণ মালার আদ্যক্ষর মেনে নেবেন এই নিবেদন। এখন বেনাম হবার সময়। নাম করণ সত্যিই সম্ভব নয়। যেদিন শুনেছি একটি ছেলের নাম বৈলম্ব্য, সেদিন থেকে নামে ভয় পেয়ে গেছি। আর নাম নয়। আসল নামরা থাকুক এখন বর্ণ মালার আড়ালে, পাবেন না খোঁজ

> কোন নামের, লক্ষ বাহু বারালে। আর নাম কেন ? অবশ্য আর গল্পই বা কেন! আপনারা নিরুপায়, কেননা শারদ-ভাইরাস সম্পাদক-পাঠক-লেখকদের আক্রমন করবে যতদিন, ততদিন গল্প চলছে, চলবে।”[১০]

বাস্তব কাহিনিকে আড়ালে রেখে কল্পনা মিশিয়ে পাঠক বা দর্শকের মনকে আকৃষ্ট করার রীতিকেই মহাশ্বেতা প্রতিবাদী ভাষায় ব্যঙ্গ করেছেন। বিশেষ করে চলচ্চিত্র জগতের চিত্র শিল্পী প্রডিউসারদের প্রতিই নিক্ষিপ্ত হয় মহাশ্বেতার তীর। গল্পের কাহিনিতেও তাই লক্ষ করা যায়।

গল্পে একই সঙ্গে দুটি দিক থেকে কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। পালামৌ অঞ্চলের হরিজন সম্প্রদায়ের, আদিবাসী নিম্নবৃত্ত সম্প্রদায়ের দু:খ যন্ত্রণায় পরিপূর্ণ ‘তেতরি কহানি’। তেতরি ভুঁইন আদিবাসী সম্প্রদায় ভুক্ত নিম্নশ্রেণির দরিদ্র এক অসহায় সুন্দরী রূপবতী স্বাস্থ্য সুঠাম ভরা যৌবনা প্রাপ্ত বিধবা। দুই সন্তানের জননী বিধবা তেতরি, বিশাল ভুইয়ার প্রেমে পরে। এবং তারই ঘর করে। কিন্তু ব্যপারটি তসিলদার সিং এর পছন্দ হয় না। তাই তো তসিলদার তেতরিকে তার নিজের ঘরে যেতে বলে। কিন্তু তেতরি প্রতিবাদ জানায়, প্রতিবাদের আগুনে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তসিলদারের আস্পর্ধা বসতই তার মুখে থুথু দেয়। মহাশ্বেতা এখানে তেতরির প্রতিবাদের প্রভাব ভাবনার কথা বলতে গিয়ে জানিয়েছেন,

> “তেতরি তার মুখ থুকে দেয়। হঠকারী কাজ। টাউনের কাছাকাছি কোয়েলের তিরে ঘর থাকলে মনে এমন দু:সাহস জাগে। তাছারা ‘তেতরি’, ‘অশান্তি’, ‘লাঙা’, ‘দূর্গা’, ‘বেআবরু’, ‘কহানি ফুলকি ; এসব পিকচারে রিতা ভাদুরী, জিনত আমন, পরভিন বাবি, হেমা মালিনি, এদেরকে দমাদম

> গুলি চালাতে দেখে তার মনে সাহস জাগতে পারে, যে সাহস অলীক।”[১১]

নারীর নিজস্ব মর্যাদা এবং সন্মান রক্ষা করার ক্ষেত্রে সিনেমা বা চলচ্চিত্রেরও যে একটা বড় ভূমিকা রয়েছে তা মহাশ্বেতার উক্তিতে এবং তেতরির প্রতিবাদের ভাষা ও ব্যবহারে বুঝতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু সয়তান ক্ষমতা শালী আভিজাত্য তসিলদারের ক্ষমতার সঙ্গে লড়াই করে তেতরি নিজের ইজ্জত রক্ষা করতে পারলেও দ্বিতীয় স্বামী বিশালকে রক্ষা করতে পারে না। অর্থাৎ তসিলদার তার গরম রক্ত, পবিত্র, ক্ষত্রিয়, রাজপুত ত্যাজের দ্বারা বিশালকে মেরে ফেলে। যার ফল স্বরূপ তেতরির প্রতিবাদী রূপ আরও অধিক পরিমানে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। শান্ত করতে পারে না নিজেকে। প্রতিশোধের আগুনে আরও বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠে তেতরি। তাইতো তার আচরন হয় এরকম,

> “নতুন, কর্মবীর এক তসিলদারকে গ্রামে ঢুকতেই কেন যেন মারে, জখম করে। তসিলদার সিং, তসিল বদলে ছিল। টাউনের উৎসাহি উকিল বলরামের চেষ্টায় তেতরির মাত্র ছমাস কারাদন্ড হয়। তারপর তেতরি আবার বিশালের ঘরে। তসিলদার সিংকে ও আচরে কামড়ে জখম করেছিল বলে শোনা যায়।
>
> জানা যায় তসিলদার পাটনা গিয়ে চিকিৎসা করায় এবং তার হাতের একটি আঙুল বাদ দিতে হয়।.....
>
> (ম) গৌরকে বলেছিল, ওর দেহ ব্যবস্থায় ক্রোধ ঢুকে গেছে। এর আর কিছু করা যাবে না।”[১২]

বলতেই হয় তেতরির বিদ্রোহের রূপের অসামান্যতার কথা। কেননা যে তসিলদার তাকে পেতে চেয়েছে কিন্তু পায় নি, তাই বিশালকে খুন করে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য।

কিন্তু এই খুনি তসিলদারকে না পেয়ে তেতরি অন্য তসিলদারকে আক্রমন করে বসে। এখানে স্পষ্ট বোঝা যায় তেতরি শুধু একজন তসিলদারকেই নয়, গোটা তসিলদারি সমাজ ব্যাবস্থার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করে বসে। সমাজ শোষণ ও নির্যাতনকারী গোটা উচ্চ শ্রেণির সমাজ ব্যবস্থাটাই হয়ে ওঠে তেতরির কাছে এক ঘৃন্য সমাজ। তেতরিদের সমাজের সমস্ত যুবতী সুন্দরী যৌবনা প্রাপ্ত নারীরাই ঐ উচ্চ শ্রেণির জোতদার, ঠিকাদার, তসিলদারদের নির্যাতনের জন্যই যেন পৃথিবীতে আসে। তেতরিও জানতো,

> "……ওর জীবনের সমস্ত ঘটনাই শরীরের কারনে। শরীর ও মন বিশালকে চেয়েছিল। আবার তসিলদার চাইলো ওর শরীর কে একটা শরীর ভাঙিয়ে খেলে ও রেণ্ডি গলি পৌঁছে যাবে। না ভাঙলে গইঠা ঘষি, লাকাড়ি উকাড়ি, ভাগে বকরি চরাইন করলে ও ভুঁইন মেয়ে হয়ে যাবে। প্রবল জেদে ও ভুঁইন মেয়েই হবার ভূমিকা নির্বাচন করে।"[১৩]

তেতরির এটাও একটা প্রতিবাদী রূপেরই বহি: প্রকাশ। কেননা সে বুজে গেছে, গোটা সমাজ ব্যবস্থায় যখন নারী নির্যাতনের কবলে শোষিত হচ্ছে লাঞ্ছিত হচ্ছে, শোষন, খুন, রাহাজানিতে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, সেখানে একজন নারী গোটা সমাজ ব্যবস্থাটাকে পাল্টাতে পারে না। যদি না সমাজের উচ্চশ্রেণির সমস্ত মানুষ একত্রিত হয়ে সমাজের শোষণ হীনতার পরিকল্পনা মূলক ব্যবস্থা না করে। তাই তো 'ন', 'ম', 'গৌর', 'তেতরি', সকলেই ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে সামাজিক বিধি নিষেধের, নিয়ম কানুনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে থাকে।

> "…….. গৌর তার বান্ধবী (ন) কে মনের কথাটি বলে। (ন) কম্পুটারে ট্রেনিং নিয়েছে। ভালো চাকরি করছে। গৌরভকে ও বিয়ে করবে না অথচ ওর বান্ধবী থাকবে তা বলেছে। বিয়েটা অন্য জিনিস। নিরাপত্তা দরকার।

> (ন)-র বাবার নিজস্ব নিরাপত্তা সার্ভিস আফিস আছে। (ন)-র মা চিরকাল বলেছেন, মেয়েদের সব চেয়ে দরকার নিরাপত্তা।
>
> তিনি বৈবাহিক নিরাপত্তার কথাই বলেছেন। কেননা রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে মেয়েদের নিরাপত্তার কথা ভাবার বুদ্ধি তার নেই।"[১৪]

বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, আদিবাসী – অন্তেবাসী, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল সম্প্রদায়ের নারী সমাজের মধ্যেই নারীর এক নতুন সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের প্রস্তুতিরই পূর্ব পরিকল্পনা। যাতে করে কোন দিন এই রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় নারী সর্বোপ্রকারে শাসন মুক্ত হবে। তাইতো তেতরির কাহিনি নিয়ে সিনেমা তৈরি হলে মানুষ সচেতন হবে। সর্বোপ্রকারের মানুষের সন্মুখে তাদের অবস্থার কথা জানাতে পারবে। সরকারী অনুদান মিলবে এই তাদের প্রত্যাশা। এ কারনেই এই গ্রামের মানুষের গলার ঘ্যাগ এবং আয়োডিনের অভাব জনিত রোগ এবং তেতরির নির্যাতন ও প্রতিবাদ, বিদ্রোহ এবং সংঘাত নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণে গৌর আগ্রহী হয়। এবং তেতরির গল্প কাহিনি রচনা করে। কিন্তু ফিল্ম প্রডিউসার তেতরির কাহিনিকে নির্মাণ করেন নিজের মতো করে। বাস্তবে তেতরির জীবনে যা হয়েছে তা থাকছে বটে কিন্তু দর্শকের কথা এবং সিনেমার দ্বারা উপার্জনের কথা মাথায় রেখে বাস্তবতার ভিতকে কল্পনার রঙে রাঙিয়ে (ক) বাবু কাহিনি বানায় এভাবে, -

> "গৌর! গল্পের প্রথমে তেতরি কুমারী থাকছে। ও সব বিধবা টিধবা চলবে না। ছেলে মেয়েও বাদ দিতে পার। আসলে বিশাল–তেতরি–তসিল দার, এটাই হবে গল্প।
>
> শেষে, বিশালকে পুলিশই মারছে এবং মারার কারণ তসিলদার তেতরিকে আগেই ধর্ষন করেছে। প্রতিবাদ করতে গিয়ে বিশাল মরছে। তসিলদার তেতরির ঘর ভেঙে দিচ্ছে।"[১৫]

বাস্তবতার ভিত্তি থাকে একদিকে অন্যদিকে থাকে কাহিনির স্বাতন্ত্র্য। বাস্তবতার মিলহীনতার জন্যই গৌর (ক) বাবুর সঙ্গে ঐ কাজ করা বাদ দেয়। কেননা সেই খানে তেতরির কোন প্রতিবাদ থাকে না। অথচ তেতরি এক রক্ত বীজ বোপন কারী বিপ্লবীনি বিদ্রোহিনী নারী। উত্তরোত্তর তার বিদ্রোহের পরিমাপ বেড়েই চলে। তাকে থামিয়ে রাখা যায় না কোন কাজেই। কাহিনির অন্তিমে (ম) তাই বলেছে তেতরির কথা, -

> "তেতরি এখন একটা অন্য গান গায়, ছিউড়িয়া ঝুড়ন মেঁ হিরনিয়া উদাস ..... এটিও কোন সিনেমার গান নয় এবং তেতরির ক্রোধ এখনও ওকে জ্বালিয়ে রেখেছে। সেদিনই পূর্তবিভাগে হল্লা করে এসেছে, বিশালের বদলে আমাকে কাজ দাও।
>
> গৌর চিঠি পরে বার বার। কোথায় জোর পায় তেতরি কেন মানছে না, সমানে মাপ ছারিয়ে বড় হচ্ছে।"[১৬]

নারীর প্রতি যতদিন শোষণ, নির্যাতন চলতে থাকবে, নারীরা যতদিন ধর্ষিত হতে থাকবে ততদিন নারীরাও উত্তরোত্তর বিদ্রোহী হয়ে উঠবে এই বার্তাই প্রদান করে তেতরি। এ আসলে মহাশ্বেতা দেবী শৈল্পিকতার মধ্যদিয়ে নারীর নতুন সম্ভাবনাময় রূপটি প্রকাশ করেছেন।

হীরামোতি

প্রথম প্রকাশ : সারদীয়া ‘ আনন্দ বাজার পত্রিকা’ ১৩৯৪ / ১৯৮৭ খ্রি:

‘হীরামোতি’ গল্পেও হীরামোতি নামক একটি মেয়ের প্রতিবাদী জীবনের কাহিনি পরিলক্ষিত হয়। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রাজনীতির ঘেরাটোপে হীরামোতি বাল্যকাল থেকেই দু:খ, দারিদ্র ও অসহায় ভাবে জীবন যাপন করতে থাকে। শুধু হীরামোতিই নয়, পুরুষ তান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় প্রায় সমস্ত নারীকেই এই একই রকম ভাবে জীবন যাপনে অভ্যস্ত করে রাখা হয়। এই প্রসঙ্গে মহাশ্বেতা নিজেও উক্ত গল্পে নারীর জীবন যাপন অবস্থার কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন,

> ‘..... সব বিপ্লবী যৌবনের রমনী আলেখ্য যাত্রাতেও কোন রমনী বিদ্রোহী হয় নি। শেষ অব্দি স্বামীর পদপ্রান্তে মাথা রেখেছে এবং সন্তান লাভের জন্য গান গেয়ে আকুলি বেকুলি করেছে।’[১৭]

অবহেলিত, বঞ্চিত, পদদলিত নারীরা চিরকালই পুরুষ তান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার কাছে শোষিত হয়ে এসেছে। তাইতো প্রতিবাদ করা তো দুরের কথা সে কথা মনে ভাবার মতো দু:র্সাধ্য পর্যন্ত হয় নি কোন নারীর। আর তাই তো নাটকে, যাত্রায় নারীর মাথা নত করা

পর্যদুস্ত রূপটি দর্শক সাধারণের সম্মুখে উত্থাপিত হয়। কিন্তু হীরামোতির মা পরিপূর্ণ ভাবেই প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। চারটি জীবিত ও কয়েকটি মৃত সন্তান জন্ম দেওয়ার পর যখন আর এক বার সন্তান সম্ভবা হয় সুরধুনী তখনই সে স্বামীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়।

> "..... সে দেবতাকে নিজ শয্যা থেকে নির্বাসিত করে।
>
> আর পারতাম না। ক্ষেমা দাঁও বলে, সে শীর্ণ নিতম্ব উল্টে ঘুমিয়ে পরে। দেবতার মনে বড় ঘা লাগে এবং সে হীরামোতিকে বলে তার মায়ের চরিত্র গেছে।
>
> বউ যে অসৎ চরিত্র, এ কথা সে এখন থেকেই বলতে থাকে। গর্ভ ধারণ করবে না, অপারেশন করাবে এবং স্বামীর সঙ্গে শয়নে নারাজ, তিনটি যোগ করলে যোগফল আর কি হয়?"[১৮]

এভাবেই অসতী জীবন নিয়ে সুস্থ এবং স্বাভাবিক ভাবে জীবন যাপন করে সুরধুনী। কিন্তু সমস্যায় পরে যায় হীরামোতি। হীরামোতি ঘাস কাটে, ঘাস বেঁচে, মোক্তারের বাড়ি থেকে ভাত বহন করে নিয়ে আসে বাবা দেবতা মন্ডল ও বাকি চার ভাই বোনকে বাঁচিয়ে রাখে। অথচ দেবতা এই মেয়েকে নিয়েই শুরু করে দেয় বিয়ের ব্যবসা। হীরামোতিকে বিয়ে দেয় একশো টাকার বিনিময়ে এক বৃদ্ধের সঙ্গে। দ্বিতীয় বার বিয়ে দেয় একটা বকন গরুর বিনিময়ে। হীরামোতি এই বকনটিকে প্রান দিয়ে যত্ন করে। বকনাটি বড় হয় বাচ্চা দেয় হীরামোতি এখন দুধ বেঁচে নিজের জীবন বাঁচায়। হীরামোতির যৌবন দিনে দিনে ভরে ওঠে পাড়ার ছেলের নজরে পরে যায়। পাশাপাশি ঘুর ঘুর করে অথচ সমস্ত দোষ গিয়ে পরে হীরামোতির উপর। বিদ্রোহী হীরামোতি ছোটথেকেই মাকে দেখেছে চিনেছে, তাইতো সতেজে বলে,

> "পোলারাও জানি আমার পাছে না ঘুরে তেমুন ব্যবস্থা করবেন! বিয়া হইছে আমার। বিয়া ভাঙছে আমার। তারা

ক্যান আমার পাছে ঘুরে? দোষ হইতে মাইয়ার হইত, এইতো বিচার। আপনারা কেও ডাকের কাকা, কেও ডাকের জ্যেঠা, সকলের নিবেদন কইরা গেলাম। পরনাম!”[১৯]

ন্যায় এবং ন্যায্য কথা বলাটাও পুরুষ তান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নারীদের অন্যায় হয়। তাইতো হীরা মোতির বাবার কাছে হিরামোতির প্রতিবাদের জন্য একান্ন টাকা জরিমানা করা হয়। সে ক্ষেত্রে হীরামোতি নিজের দুধ বিক্রীর টাকা দিতে অরাজী। প্রতি পদে পদে হীরামোতি প্রতিবাদ করে যায়। কেননা সে বুঝতে পেরেছে পুরুষ তান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায়ক্ষমতাপ্রয়োগের মাত্রার। দেবতা এখন আর হীরামোতিকে সেরকম স্নেহ করে না। যে ভাইদের কোলে পিটে করে মানুষ করেছে খাইয়ে দিয়েছে, বড় করেছে তারা আজ বড় হয়ে হীরামোতিকে চিনতে পারে না। হীরামোতি আজ হয়েছে তাদের পরিবারে এক পাপিষ্ট কাঁটা। কারণ তৃতীয় বার দেবতার উপদেশে হীরামোতি বিয়ে করেনি। সে নিজের ইচ্ছায় নিজের পছন্দ মতো নিজের ভালোবাসার মানুষ চায়ের দোকানি গোপালকে বিয়ে করে। এই বিয়েটা হীরামোতি নিজের পছন্দমতো করে কলকাতার কালিঘাটে পালিয়ে গিয়ে। তার মাসির বাড়িতে থাকে দুজনে কাজ করে যেভাবে হোক সংসার চালাবে এবং সুখে দু:খে জীবন কাটাবে এই তাদের স্বপ্ন। কিন্তু বিবাদ বাদে সমাজ ও সামাজিক রাজনীতি। রাজারাম তাদের ধরিয়ে দেয় পুলিশকে। হীরামোতিকে আগেই ছেড়ে দেয় কিন্তু গোপালকে জেলের কয়েদি বানিয়ে রাখে। পুলিশ হীরামোতিকে শাসানি দেয়। দেবতাও হাহাকার করে বংশের ইজ্জত যাওয়ার জন্য। হারাম জাদি বলে গালি গালাজ করে। হীরামোতিকে তাদের সমাজ আর মেনে নেয় না। এবার হীরামোতি পাগলিনির মতো উন্মাদ হয়ে পরে। নীরবে সমস্ত জ্বালা যন্ত্রনা সহ্য করার মতো মেয়ে হীরামোতি নয়। প্রকৃত পক্ষে সে প্রতিবাদের আগুনেই পাগল হয়ে যায়। এবং বিভৎস বিদ্রোহী কণ্ঠে প্রতিবাদ জানায় মনের ক্ষোভে,-

“হীরামোতি ওঠে। উনান থেকে ভাতের হাড়ি উঠানে আছড়ায়। অশুচ লাগবে রান্ধ ক্যান?

জলের কলসি, শিকেড় হাড়িতে খলবলে বিলের কই মাছ আছড়ে আছড়ে ফেলে ও। বাতায় গোজা দা টেনে নেয়। লাঠি মেরে উনোন ভাঙে, আগুন ছিটকায়।

দা ঘোড়াতে থাকে ও।

অহন আমার লজ্জা নাই। জানের মায়া নাই। দেবতা মন্ডল আমার সব খাইছে। আমার পয়সায় খাইয়া লইয়া আমারে গাল? সমাজে উঠবা? মাথা ফালাইমু সকলটির।

তীব্র চিৎকারে হীরামোতি বলে সমাজে উঠবা ? রাজা রামের সমাজ? নিজে থাকে পিছনে, মাস্তান লাগাইয়া ব্যবসা করে। সেই সমাজপতি?

সমাজ পতি?

রক্তঝরা (সস্তায় বেনারসী) মেকি সোনার অলঙ্কার ও সিঁদুরে জ্বলন্ত হীরামোতি দা ঘোড়ায়।

যে আউগাইবে, তারে কাটুম। চল্লাম আমি। তোমাগো সমাজ লইয়া তোমরা থাক। তোমাগো মুখ পুড়াইতে আমি জানি, দেইখ্যা লইও।

হনহন করে বেড়িয়ে যায় হীরামোতি।

ক্যাও আউগাইও না। অহন আমি পাগল। পাগলে মনিষ্য কাটলে তার কোন শাস্তি নাই।”[২০]

হীরামোতি বুঝতে পেরেছে চাপিয়ে দেওয়া সতীত্ব রক্ষার চাপ কতটা কঠিন ও রূঢ় বাস্তব। তাইতো নিজেকে অসতী রেখেই হীরামোতি বেড়ীয়ে যায়। যে সমাজে অশুচ, অসতী বলে কোন শব্দ থাকে না। রাজা রামের মতো সমাজ পতি থাকে না সেই সমাজের

সন্ধানে। স্বামী গোপালকে কীভাবে জেল থেকে বের করতে পারবে সে চিন্তায় মগ্ন হয়ে পরে। এবং পরবর্তী সময়ে জানতে পারে গোপাল জেলে নেই। তাকে রাজারাম বের করেছে এবং আবার দোকান ধরিয়ে দিয়েছে দুই নাম্বারি ব্যবসার। সমাজ এবং সামাজিক বিধি নিষেধ হীরামোতি এবং গোপালের দাম্পত্য জীবনকে সুখি হতে দেবে না। তাইতো তাদের জীবন আরও বেশি ট্র্যাজেডিতে পরিনত হয়। একে অপরের প্রতি গভীর ভালোবাসা থাকার সত্ত্বেও হীরামোতি তার প্রিয় ভালো বাসার গোপালকে ছাড়তে বাধ্য হয়। এবার কি করবে থানা পুলিশ সকলই রাজা রামের মতো রাজনৈতিক নেতা যেখানে থাকবে সেখানে কোন অসহায় গরীব পুরুষ কিংবা দরিদ্র সুন্দরী যুবতি কারও কোন কিছু হতে পারে না।উত্তরোত্তর রাজা রামের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতেই থাকে। তাইতো গল্পের অন্তিমে হীরামোতির বিদ্রোহের অগ্নি দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। এবং প্রতিশোধের স্পৃহায় ঝাঁপিয়ে পরে। রাজারাম যখন বলে,

“গোপালের আছে কি? (রাজারাম অসভ্য ঈঙ্গিত করে) আমরা থাকতে তুই তারে ধরলি ক্যান? আমি পারতাম না?

হীরামোতি মাথা নাড়ে।

চল তোরে অহনি দেখাই আমি পুরুষা কিনা।

রাজারাম ঈশৎ প্রমত্ত খানিক ঝোঁকে।

হীরামোতি ওকে প্রচন্ড ধাক্কা দেয়।

ছুঁইস নারে অশুচ!

রাজারাম টলে যায়। দোকানিরা দেখে যায়।

আউগাইলে গলা ফালাইয়া দিমু।

পাড়ায় ঢুকতে আসিস তুই ! ঢিল মাইরা খেদাইতাম। আমাগো ইজ্জত আছে, এটা বারোভাতারির পাড়া নয়।

আমি বারো ভাতারি?

হীরামোতি হাতের ব্যাগ দিয়ে ওর মুখে মারে, ওর কলার ধরে হিচকে নামায়, গলার পিছন দিকে টানে, ফলে রাজারাম গোলায় হিক্কা তোলার মতো শব্দ করে ও ওর চোখ বিস্ফারিত।

অরে ইজ্জতের বেপারি! বার ভাতারি হীরামোতি নয়। যা তগো দেবতা মন্ডলেরে ডাক্। আমার ঘর ভাঙছিস তুই। নেশার কারবারি কে? পাড়ার নেতা কে? আমার পিছে ল্যাল ধাইত কে? জোবাব ক'নে তোর?

হীরামোতি ওকে ভীষণ আক্রোশে মারতে থাকে, মারতে থাকে। ইজ্জত, মাইয়ার আর বেচে বাপ, রায় দেয় সমাজ। তগো ইজ্জতে আমি থুথু দেই। তগো অশুচের পাড়ায় আমি যাই না। আমারে পথে নামাইছে কে? আমার ঘর নাই ক্যান? .....

একজন বলে, রাজারাম কি করছিল?

হীরামোতি বলে, কুপরস্তাব দিতেছিল।

সবাই চুপ।"[২১]

নারীদের যে তার মৌলিক অধিকার আদায়ের প্রচেষ্টায় সক্রিয় হয়ে উঠতে হবে। তাই নারীরা আজ হয়ে উঠেছে বিপ্লবিনী, বিদ্রোহিনী, প্রতিবাদিনী এবং সংঘাতে বিশ্বাসী। কেননা পুরুষতন্ত্র তাদের জন্য যুদ্ধ ক্ষেত্রই তৈরি করে রাখে। এই কলুষিত ঘুন ধরা সমাজ তাদের কোন মর্যাদা দেয় না। নারীর ব্যক্তি মর্যাদা নারীকে নিজেকেই ক্ষমতায় দাঁড়িয়ে উপার্জন করতে হবে। তাইতো হীরামোতিরা ততোদিনই লড়াই করবে যতদিন পর্যন্ত রাজারামদের মতো সমাজের অন্যায়কারী ক্ষমতাবান কাপুরুষেরা জীবিত থাকবে। সমাজ যে একদিন নারীর সর্বোপ্রকারের স্বাধীনতা প্রদান করতে বাধ্য হবে এই সম্ভাবনারই শৈল্পিক ভাষ্য প্রকাশিত হয়েছে মহাশ্বেতার হীরামোতি গল্পটির মধ্যদিয়ে। কেননা হীরামোতি যেমন অসহায় নাবালিকা শিশু থেকে যৌবনে পদার্পন অব্দি যে শোষন নির্যাতন দেখেছে, সহ্য করেছে। আগামী প্রজন্ম তা দেখার বা সহ্য করার অপেক্ষায় থাকবে না। তারা জন্ম সূত্রেই হয়ে উঠবে প্রতিবাদী, বিদ্রোহী এবং সর্বোক্ষমতা সম্পন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সচেতন। এই সম্ভাবনাময় দিনটির স্বপ্নই দেখিয়েছেন মহাশ্বেতা হীরামোতির

মধ্যদিয়ে। এবং প্রচার করতে চেয়েছেন সমস্ত পাঠক বর্গের মধ্যদিয়ে সর্বোস্তরের মানুষের মধ্যে।

ইটের পরে ইট

প্রথম প্রকাশ : স্থানকাল অজ্ঞাত, গ্রন্থাগারে প্রথম প্রকাশ আষাঢ়, ১৩৮৯ / ১৯৮২ খ্রি:

'ইটের পরে ইট' গল্পটি মহাশ্বেতার একটি অন্যতম গল্প। এই গল্পে আদিবাসী সম্প্রদায়ের (হো, মুন্ডা, সাঁওতাল, খড়িয়া প্রভৃতি অন্ত্যজ) জীবনের চরম দুর্দশাগ্রস্ত জীবন কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। আদিবাসী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত এলাকায় সরকারী কোম্পানী, সিমেন্ট কোম্পানী, হাওয়াই জাহাজ নামানোর পথ নির্মান প্রভৃতি প্রকল্পে বহু আদিবাসী জনজাতীর জমি সরকারী কোম্পানী নির্মাণের এলাকার মধ্যে পরে যায়। যার ফলে বহু আদিবাসী মানুষের ঘর বাড়ি ভেঙে ফেলে, জঙ্গল কাটা হয়, বনভূমি নষ্ট হয়। আগুনে পুড়ে ছারখার করে দেয় বন জঙ্গল, ঘরবাড়ি অথচ এদের কোন ক্ষতি পুরণ দেওয়া হয় না। আবার এই বন জঙ্গল এই সম্প্রদায়ের মানুষের এই জঙ্গল থেকেই ফলমূল সংগ্রহ করে জীবন অতিবাহিত করে। জানুম সিংহের মতো উচ্চ শ্রেণির নেতা, জোতদার, মহাজনেরা এই শোষণ ও নির্যাতনের কাজে মদত দেয়। ফলে লেগে যায় বিদ্রোহ, আন্দোলন এবং অলগ খন্ডি লড়াই। এই লড়াইয়ে বহু আদিবাসী যুবক-যুবতী, নারী-পুরুষ-শিশু মারা যায়। সরকারী প্রশাসনিক শক্তির বন্দুকের কাছে আদিবাসী সম্প্রদায়ের তির ধনুক, বল্লম, হাসুয়া, হয়ে যায় অকেজ। ফলে হাজার হাজার আদিবাসী নিহত হয় সরকারী পুলিশের এবং মস্তানের হাতে। কোম্পানীর চুল্লিতে যে কত আদিবাসী মানুষকে পুড়ে ফেলে তার সঠিক হিসেব বের করে না। সি. আর. পি., বি. এম. পি. পুলিশ, যখন যাকে খুশি ধরে এনে জেল

হাজতে রাখে। ফলে প্রান বাঁচানোর তাগিদে সমস্ত আদিবাসী সমাজের নর-নারী জঙ্গলে আত্ম গোপন করে। স্বজন হারানোর কান্নায় ভেঙে পরে গোটা আদিবাসী সমাজ।

অলগ খন্ডের এই আন্দোলনে শুধু যুবা পুরুষেরাই নয় নারীরাও পুরুষদের সঙ্গে বিদ্রোহের নিশান হাতে নিয়ে এগিয়ে আসে। আদিবাসী সমাজে নারী পুরুষের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই। আর সে কারনেই নারীরা অনেকে এই বিদ্রোহে নেতৃত্বও প্রদান করেন। মাটা গাগরাইয়ের দুটি ছেলে সন্তান কোলহানকে দান করেছে, তারা এই বিদ্রোহে বিরোত্বের প্রমান দিয়ে নিজের জীবনকে দান করে। তাইতো এবারে লুদরি মাটা গাগরাইয়ের একমাত্র কন্যা নিজে স্বেচ্ছায় কলহান হতে এগিয়ে আসে। এবং অত্যন্ত সুদক্ষভাবে যুদ্ধ পরিচালনার পরিকল্পনা করে। লুদরি বুঝতে পেরেছে রাজনৈতিক শক্তির প্রকৃত কৌশল কতটা এবং কিভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে। সাংস্কৃতিক রাজনীতির প্রয়োগ অত্যন্ত তীব্র গতিবেগে ছেঁয়ে ফেলছে আদিবাসী জন জীবনের প্রতি। তাই সমাজ সচেতন, সাংস্কৃতিক রাজনীতি সচেতন লুদরি রাজনৈতিক নেতার মতো করেই নিজের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রয়োগ করে বুঝতে পেরেছে এবং ধরতে পেরেছে সমাজের প্রকৃত স্বরূপটাকে। এবং সে কথাই তার বাবাকে বলেছে,

> "সরকারের কাছে কলহানের এক চেহারা, জঙ্গল দপ্তর ও ঠিকাদারের কলহান টাকা লোটার জায়গা, পুলিশের কাছে কোলহান গুলি চালাবার জায়গা, আদালতের কাছে কোলহান ছেঁড়া ফেসে গরীবকে ফাঁসাবার জায়গা, মিশনারীর কাছে কোলহান বাইবেল–বেবিফুড সেবা কাজের আড়ালে আদিবাসীর ভিতড় ক্যাথলিক প্রোটেস্টেন্ট চার্চের হাজার ফ্যাকরা তুলে হাজার রকমে খ্রিষ্টান করে মূল জন জীবনের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটাবার জায়গা, হিন্দু সাম্প্রদায়িকের কাংছে কোলহান দাঙ্গা বাধাবার ও হিন্দু জঙ্গী শক্তি উপাসক তৈরি করার জায়গা, বিদেশের খোঁচরদের কাছে কোলহান গবেষণা বা গ্রাম সেবা বা অলগ খন্ডে মদত দান উপলক্ষে টাকার

> রেলা দেখাবার জায়গা। এক জায়গায় সবাই এক। কোলহানের জঙ্গী গরীবদের ঐক্য ভাঙো, ওদের টাকা দিয়ে নষ্ট কর। আর বড় বড় শিল্পপতির কাছে কোলহান বহুত দরকারী।"[২২]

লুদরি বুঝতে পেরেছে স্বার্থপর দুনিয়ায় সব ধরনের শক্তিরাই সাংস্কৃতিক রাজনীতির বেড়াজালকে দৃঢ় ও শক্ত করার প্রচেষ্টায় সবাই মত্ত। তাইতো নিজেদের সাম্প্রদায়িক দুর্দশা-দু:খ ঘোচাবার জন্য সে নিজেই নিজের স্কন্ধে দায়িত্ব তুলে নেয়, ডাল মিয়ার খাদানে যেতে চায়, ইউনিয়ন করবে। লড়াই করার সব রকম কৌশল তার জানা। ধর্ষিতা, নির্যাতিতা, অবমানিতা কোলহানের সমস্ত রকম নির্যাতন থেকে মুক্ত করবে এই হল লুদরির জীবন সংগ্রামী পণ। একজন নারীও যে গোটা সমাজের সম্প্রদায়ের কথা এমন দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় সঙ্গে ভাবতে পারে এবং নিজের জীবনকে পর্যন্ত উৎসর্গ করতে রাজি থাকতে পারে তা আমরা লুদরির মধ্যদিয়ে লক্ষ করি। যে নারী অস্ত্র হাতে প্রশাসনিক সৈনিকের অন্যায় এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করে। জোতদার ও কোম্পানীর মালিকের বুদ্ধির লড়াইয়ে নিজেও বুদ্ধির বেড়াজাল তৈরি করে। এবং গোটা ভারতবর্ষের সমাজ জীবন থেকে শোষণ নির্যাতনকে, অভাবকে পরিপূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করার স্বপ্ন দেখে। অনায়াসেই বলা যায় আগামী দিনে নারীর নতুন সম্ভাবনায় এক স্বতন্ত্র জগৎ নির্মাণের ক্ষেত্রে লুদরি একজন প্রতিবাদের বা বিদ্রোহের পথ প্রদর্শনকারী নারী চরিত্র হিসেবে সম্পূর্ণ সার্থক।

অপরদিকে জোসিন, ফুলমনি ও নামসি নামের অপরূপা সুন্দরী আদিবাসী মেয়েরা পরে যায় নান্দির ছোঁবলে। এই গল্পে নান্দী একজন সর্দারনি অর্থাৎ নারী পাচার চক্রান্তের অন্যতম ঠিকাদার। সেও আদিবাসী সম্প্রদায় ভুক্ত অনুন্নত অন্ত্যজ শ্রেণির মেয়ে ছিল। চরম দারিদ্রতার মধ্যে দিন যাপন করে অন্যবস্ত্র থেকে শুরু করে বাসস্থান পর্যন্ত কোন কিছুরই নিশ্চয়তা ছিল না। শেষে নান্দি চলে যায় ইটভাটার মালিকের হাতে। সেখানে রূপ যৌবন, চেহাড়া যতদিন সুন্দর সুস্থ ছিল ততদিন সে মালিকের ছিল। মালিকদের এক হাত থেকে

অন্যহাতে প্রতিনিয়ত বিক্রি হত নান্দি। নান্দির জীবনের কথা বলতে গিয়ে মহাশ্বেতা জানিয়েছেন,

> "বছর পাঁচেক মালিক তাকে রাখে, তারপর বেঁচে দেয় আরেক মালিককে। এই মালিক তাকে ভারা খাটাত। পয়সা মালিকের, সে আজ ড্রাইভারের, কাল ঠিকাদারের। আস্তে আস্তে নান্দি রক্তে রক্তে বদলে গেল।
>
> একদিন মালিক বলেছিল, তুই বুড়ি ভঁইসি হয়ে গেছিস নান্দি। তোকে দিয়ে আর কাজ হবে না। কোন গ্রাহককেই তুই খুশি করতে পারবি না। .....
>
> ভাবছি। গরু মোষ নোস যে কসাই কিনবে বা পিঁজরাপোলে দিয়ে দেবে।"[২৩]

এইভাবেই নির্যাতীত রেন্ডি নান্দির শরীর কোন এক সময় ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে যায়। এবং নিয়োগ করে রেজা আনার কাজে। অর্থাৎ দরিদ্র গ্রাম থেকে যে স্থানে মানুষ খেতে পারে না, কাপড় পায় না, দু:খকষ্টে দিন যাপন করে সেখান থেকে যুবতি সুন্দরি মেয়ে নিয়ে আসে নান্দি। আর বিক্রি করে দেয় হিদায়েত আলির কাছে ও ধনি বড় লোক নীলু বাবুর কাছে। আর তাতে অগুন্তি বেহিসাবি পয়সা পায় নান্দি। এভাবেই একজন সাধারণ জীবন-যাপনকারী অসহায় রূপবতী সুন্দরি মেয়ে নান্দি প্রথমে হয়ে ওঠে রেন্ডি এবং পরবর্তিতে হয়ে যায় রেন্ডির সর্দারনি।

এই নান্দির নজরে পরে যায় জোসিন, নামসি, ফুলমনিদের মতো সুন্দর রূপবতী যুবতিরা ছাড়াও অলগ খন্ডের আরও হাজার হাজার যুবতি মেয়েরা। এরা জঙ্গলে গিয়ে আত্ম গোপন করে। খাবারের কন্দমূল, মেটে আলু, গাছের ফল, পাতা, সজারু, খোড়গস শিকার করে ক্ষুধা নিবারণ করলেও লজ্জা ঢাকার জন্য কাপড়ের প্রয়োজন হয়। কেননা জঙ্গল

বনভূমি খাবার দিতে পারলেও কাপড় দিতে পারে না। বাইরে বের হলে পুলিশ, মিলিটারি, সি. আর. পি., জি. আর. পি., প্রভৃতি সৈনিকদের নির্যাতন, অন্যায়, অত্যাচার, ধর্ষন সহ্য করতে হয়। এই রকম এক রাজনৈতিক অত্যাচারের মুহুর্তে নান্দি পারি দেয় জোসিনদের বসবাসকরা জঙ্গলে। নান্দি কমদামে কাপড় কিনে নিয়ে আসে জোসিনদের জন্য, যাতে করে জোসিনরা নান্দির দেওয়া প্রলোভনে এগিয়ে আসে এবং স্বেচ্ছায় রেজা গ্রহন করে। কিন্তু জোসিনরা জানে নান্দির কবলে পরলে নিজেকে রেন্ডি করে দেবে। তথাপি তারা বাধ্য হয় নান্দির খপ্পরে ধরা দিতে, মাত্র পঞ্চাশ টাকা ও একটি কাপড়ের বিনিময়ে নান্দি জোসিনদেরকে নিয়ে আসে কলকাতার ইটভাটায়। আর ইটভাটায় নিয়ে আসার পর শুরু হয় নির্যাতন ও ধর্ষণ। ভাটায় পৌঁছেই ভাটার মালিকেরা ভাগ করে নেয় মেয়েদের তাদের রূপ, যৌবন এবং সৌন্দর্য অনুযায়ী।

> "সন্ধ্যের পর ওরা জোসিন, পারাই ও নামসি কে ডাকে। বলে ঘর দেখবি আয়।
>
> হিদায়েত জোসিনকে ঘর দেখায়, নামসি ও পারাই ঘর দেখে দুই মস্তানের সঙ্গে। ঘর, বিছানা, মদের বতল। হিদায়েত বলে মাদি বিড়ালের মতো চেঁচিয়ে বা আঁচড়ে কামড়ে লাভ হবেনা কিছু। নান্দিকে সুধাও।
>
> নানা আমি রেজা কাজ করব, পাথেরা কাজ করব। আমি চাই না পাকা ঘর, ভালো বিছানা।
>
> হে হে হে। এমন গতর তোর, রেজা পাথেরা হবি কেন? তুই হলি আমার ভান্ডারী। নান্দিও ছিল সুধা কেন ওকে? তুই না চাইলে কি হবে? পাকাঘর আর ভালো বিছানা যে তোকে চায়। হে হে হে – সিং ভূমের রেজা কি আজ প্রথম এলো? তোমাদের সব ভাষাই আমি বুঝি।
>
> জোসিনের মুখে মদ ঢেলে দেয় হিদায়েত।"[২৪]

এভাবেই শুরু হয় জোসিনের নির্যাতীত ও ধর্ষিত হওয়ার পালা। জোসিনের জীবনে এই নির্যাতনের পালা আমৃত্যু পর্যন্ত চলতে থাকে। নিজেকে বাঁচানোর আপ্রান চেষ্টা করলেও ইটভাটার ফটকেতে একবার তালা পরে গেলে সে তালা ভেঙে আসার মতো ক্ষমতা জোসিনের মতো মেয়েদের থাকে না। তাছাড়া প্রতিনিয়ত শাসন ও শোষণ এবং নির্যাতনের জন্য থাকে মাসিক মাস্তান, যার ভয়ে সচ্ছল প্রতিবাদী মেয়েও নীরবে মুখ বুজে সহ্য করতে বাধ্য হয় সমস্ত রকম অত্যাচার।

হোলির রাতে নামসি, পারাই ও অন্যান্য মেয়েরা কলকাতার নেতা, মন্ত্রী, পুলিশ, মস্তান দের হাতে ধর্ষিত হলেও জীবনে বেঁচে থাকে তারা কিন্তু জোসিনের জীবনটা একেবারেই নষ্ট হয়ে যায়। কেননা সেই রাতেই জোসিন মালিকের ভাড়া করা বিশালাকার শরীরের নাম করা মস্তান বাবুদের হাতে ধর্ষিত হয় সারারাত। এবং অবশেষে জোসিনকে ঘার মটকে মেরেফেলে পালিয়ে যায় তিন মস্তান গুন্ডা বব্বু সিংরা। অবশেষে তার মৃত শরীরের কঙ্কাল মিলে ভাটার মাটিকাটা পুকুরের জলের নিচে বস্তার ভিতর ইটের উপর ইট তার উপর জোসিনের কঙ্কাল এবং তার উপর আবার ইট।

বস্তুত মহাশ্বেতা 'ইটের উপর ইট' গল্পে আদিবাসী অন্ত্যজশ্রেণির সমস্ত মানুষদের শোষন নির্যাতন এবং প্রশাসনের মানুষ মারা খেলার ছলাকলা ঐ ইটভাটার ব্যবসা বানিজ্যের অন্তদৃশ্যকে দেখাতে গিয়ে লুদরি, নান্দি ও জোসিন নামক তিনটি মেয়ের অর্থাৎ তিনটি নারী চরিত্রের মধ্যদিয়ে নারীর প্রায় প্রত্যেকটি রূপকেই উল্লেখ করেছেন। নিম্নশ্রেণির নারী পুরুষ সকলই উচ্চশ্রেণির মানুষের দ্বারা শোষিত ও নির্যাতিত। কিন্তু জোসিন, নান্দিরা যেহেতু একই সঙ্গে নিম্ন-অন্ত্যজ-শ্রেণির নিরন্ন নেংটেদের ঘরে জন্ম গ্রহন করেছে। তাই তারা একদিকে শ্রেণিগত ভাবে শোষিত হয়েছে আবার অন্য দিকে লৈঙ্গিক বৈষম্যের কারণেও হয়েছে শোষিত, নির্যাতিত এবং ধর্ষিত। তবে এ কথা অনায়াসে বলা যায় যে জোসিন এবং নান্দি চরিত্র দুটিকে গল্পে বিশ্লেষণ এবং আলোচনার মধ্যদিয়ে লেখিকা

সমাজকে সচেতন করার প্রসঙ্গটিকে নির্দেশ করেছেন। যাতে করে অদূর ভবিষ্যতে কোন নারী ঐ নীলু বাবু এবং নান্দির মতো সর্দারনির খপ্পোরে না পরে সে বিষয়ে এক সতর্ক বার্তারই যেন প্রকাশ করেছেন। মহাশ্বেতা তার নান্দনিকতার মধ্যদিয়ে ধর্ষণ, নির্যাতনকে শৈল্পিক তুলির টানে এমন ভাবে প্রকাশ করেছেন যে তার গল্পে একদিকে রয়েছে সমাজ সচেতনতার বার্তা আবার অপরদিকে রয়েছে শ্রেণিগত সাম্যবাদের এবং নারীর সম্ভাবনাময় এক সুস্থ মৌলিক ক্ষমতা ও অধিকার সংক্রান্ত বসবাসের ঈঙ্গিত। যা অদুর ভবিষ্যতে নারী তার পূর্ণ স্বরূপ নিয়ে হাজির হবে সমাজে, সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে।

দেওয়ানা খইমালা ও ঠাকুরবটের কাহিনি

প্রথম প্রকাশ : 'সাত রং' পত্রিকা ১৯৬৮ খ্রি:

'দেওয়ানা খইমালা ও ঠাকুবটের কাহিনি' গল্পে মহাশ্বেতা ধর্মীয় গোড়ামির সাংস্কৃতিক রাজনীতির চরম গ্যাড়াকলের দিকটির উল্লেখ করেছেন। তৎসঙ্গে বাল্য বিবাহকে তথা কৌলিন্য প্রথাকে হাতিয়ার বানিয়ে একজন অল্প বয়স্ক বালিকার জীবনের চরম ট্র্যাজেডিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। একই সঙ্গে উন্মোচিত হয় জাতিগত বর্ণ বৈষম্যের ভেদাভেদগত উচ্চশ্রেণির ও নিম্নশ্রেণির মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের টানা পোড়েন, শোষণ ও শাসনের দিকটি। গল্পে পিতাহীন এক দুঃখিনী মায়ের সন্তান খইমালা মা ও মেয়ে ছারা গোটা বিশ্ব সংশারে এদের আপনজন বলতে আর কাউকে দেখা যায় না। খইমালা এবং গোলক শৈশব কাল থেকে একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এসেছে অথচ সামাজিক ধর্মীয় বৈষম্যের কারনে গোলক ও খইমালা কেউ কারো মনের কথা একে অপরকে বলতে পারে নি। গরীব ব্রাহ্মন ঘরের সন্তান খইমালা ও তার মা অত্যন্ত দারিদ্রতার মধ্যদিয়ে দিন যাপন করত। কিন্তু হঠাৎ একদিন ঝড় জলের রাতে খইমালার মায়ের গুরু বাবার আবির্ভাব। সামাজিক বিধি অনুযায়ী গুরুদেবই সর্বেসর্বা, তাই গুরুদেবের কথামতো চাপে পরে খইমালার মা তার বাল্য শিশু মেয়ে খইমালাকে বিয়ে দেয় এক বৃদ্ধ কুলিন লম্পট ব্রাহ্মনের সঙ্গে। কোন বিবাহ পণ নেই অথচ খইমালার মা'র বাড়ির দলিলটা শুধু নেয়

খইমালার বৃদ্ধ স্বামী। মাত্র ছ' বছরের কন্যা শিশুকে বিবাহ দিতে খইমালার মা অরাজী হলে গুরু বাবার কঠোর তিক্ত অভিশপ্ত শাসানি লক্ষ করার মতো,

> "গুরু বাবার মুখ থেকে গালি বের হতে লাগল। মেয়ে জন্মাল যখন, নকুড় অকালে মোরল, তখন মুখে নুন দিয়ে মেরে ফেলনি কেন? মেয়ে সোহাগি? আমার ছ'বছরের মেয়ে! মেয়ে ছেলেতে কি করে? সগগে সলতে দেয়? ছ'বছরের গাই হলে দুধ দেয়, ঘোড়া হলে গাড়ি টানে মেয়েতে কি করে?"[২৫]

অবাক লাগে একটা ছ'য় ছরের বালিকা শিশুর সঙ্গে ছ'বছরের গাভীর তুলনা, ঘোড়ার তুলনা। স্বাভাবিক ভাবে ভাবলে খারাপই মনে হবে পাঠক বর্গের কিন্তু একটু গভীর ভাবে ভাবলে বুঝা যায় যে বাস্তবিক ভাবেও তাই হয়। কেননা মুক পশু গাভীর সঙ্গে সব দিক থেকেই মিলে যায় নারীর জীবন চিত্র। গাভী যেমন ঘাস খায়, খরকুটো খায়, বাচ্চা দেয় দুধ দেয় নীরবে, কোনো কথা বলতে পারে না অসহায়তাই গাভীর চরম বাস্তবতা, নারীর ক্ষেত্রেও বিষয়টি একই রকম। সমাজ সংস্কৃতিতে ধর্ম পরিবারের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেও নারী গাভীর মতো মুক পশুর জীবন যাপন করে। এদের ইচ্ছ-অনিচ্ছা নির্ভর করে পুরোটাই পুরুষ প্রভুর উপর। খই মালার ক্ষেত্রেও তাই হয়। শুধু খইমালার ক্ষেত্রেই নয়, কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়া এই সমাজে এক রকম পাপ ও অন্যায় তাই কন্যা দায়গ্রস্ত মায়ের সহৃদয়তার রূপটি বর্ণনা করতে গিয়ে লেখিকা জানিয়েছেন,

> "মেয়ে ছেলের মা হয়েছে, সে মেয়েকে বড় করেছে। এ পৃথিবীতে সে মহাপাপি। পথের বেঙ–বেঙানি লাথি মারলেও সইতে হবে,মেয়ের মা হওয়ার মতো মহাপাপ এ সংসারে নেই।"[২৬]

তাই তো নীলমনি নামক এক বৃদ্ধ স্বার্থপর ব্রাহ্মন দৈত্যের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে নিজের কন্যাদায় পূর্ণ করেন। সঙ্গে দানপত্র স্বরূপ বাড়ির নারকেল গাছ, দোচালা বাড়ি এবং শেষ

সম্বল বাড়ি চালা জমিটুকু। কষ্টে, আহারহীন, নিদ্রাহীন ভাবে দিন যাপন করে খই মালা। এদিকে খইমালার রূপ যৌবন শরীর সমস্ত কিছুই নীলমনির কাছে নারকেল গাছ এবং দোচালা বাড়ির মতোই সম্পত্তি মনে করেন নীলমনি। নীলমনি বৃদ্ধ অসহায়, শয্যাসায়ী রোগে তার শরীর অচল, রূপ যৌবনে ভরপুর খইমালার শরীর ভোগ করার মতো ক্ষমতা তার নেই। তাই তো প্রতি পদে পদে নিজের চোখের একটু আড়াল হলেই সন্দেহ করেন খইমালাকে।

বস্তুত খইমালার এই সমস্যা শুধুমাত্র খইমালার একার নয় গোটা সমাজের মেয়েদেরই এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। স্বর্গবাসী হওয়ার নাম করে যুবতি মেয়েকে বৃদ্ধ স্বামীর সঙ্গে বিয়ে দেয় এবং অচিরেই স্বামীর মৃত্যুতে বিধবা যৌবনা স্ত্রীকেও জীবিত অবস্থায় মৃত স্বামীর চিতার আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়। এ যে পুরুষ সমাজ দ্বারা নির্মিত ধর্মীয় এক স্বার্থান্বেষি নিয়ম তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এই খইমালা তার জীবনকে অচিরেই মেরে ফেলতে চায় না। সে এই পুরুষ তান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোন প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ করেনি বটে কিন্তু তাদের এই নৃ:শংস নিয়ম কানুন থেকে নীরবে সরিয়ে নেওয়ার সাহস সঞ্চয় করেছে। নীল মনির ঘরে সংসার করেছে বটে কিন্তু হৃদয়ের গোপনে লুকিয়ে ছিল সেই দেওয়ানা গোলকের নাম। যাকে সে ভালো বাসে। নীলমনির মৃত্যুর পর খইমালাকে তার স্বামীর চিতার আগুনে পুড়িয়ে মারার পরিকল্পনা করে। খইমালা তা বুঝতে পারে তখন আর নীরবে মুখ মুজে থাকে নি। প্রচন্ড ঝর জলের রাতেও সে নিজেকে বাঁচানোর তাগিদে বেরিয়ে পরে। যে গোলক নিজে নিম্নজাতের মানুষ বলে কখনও খইমালাকে নিজের মনের কথা বলার সাহস পায় নি। যে খই মালা ব্রাহ্মণ ধর্মের কঠোরতায় নিজের চাওয়া পাওয়াকে পূর্ণ করতে পারেনি। সেই গোলক এবং খইমালাই গোটা সমাজের থেকেই অনির্দিষ্ট সময় ও কালের জন্য নদীতে ডিঙি ভাসিয়ে দেয়।

মহাশ্বেতা যদিও ধর্মীয় কিছু বিধি নিষেধের দিকটিকে উল্লেখ করার চেষ্টা করেছেন, তথাপি নারীর সামাজিক বাস্তবিক অবস্থা ও মর্যাদার দিকটিও সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে

‘দেওয়ানা খইমালা ও ঠাকুরবটের কাহিনি’ গল্পে। গল্পের শেষে দেওয়ানা গোলক ও খইমালার মিলন এবং নিজেদের জন্মস্থান ত্যাগ করে দেশান্তরি হওয়ার মধ্যদিয়ে সমাজে প্রচলিত ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক রাজনীতির অস্বীকৃতিকেই নির্দেশ করেছেন। এখানে যেমন দুটি জীবনের মিলনের বাধা বিপত্তির দিক গুলি ফুটে ওঠে আবার নারীর নির্দিষ্ট জায়গা, স্থান, মর্যাদা এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার বিদ্রোহ জনিত দিকটিও নির্দেশ করে। যা খইমালা তার স্বামীর মৃত্যু পর্যন্ত সহ্য করলেও মৃত্যুর পরবর্তী স্টেজকে আর সহ্য করতে পারেনি এমন নয়, আসলে খইমালা সমাজে একচেটিয়া নিয়মকে মেনে নিতে পারে নি। তাই সে সমস্ত কিছুকে ত্যাগ করে পালিয়ে যায় গোলকের সঙ্গে এবং একই সঙ্গে সমাজের সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়-রাজনীতির গ্যাড়াকলকে নীরবে যেন বুড়ো আঙুল দেখিয়ে যায়। এ আসলে নারীর নিজস্ব চেষ্টায় সতীদাহ প্রথা এবং সমাজের শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে নারীর নিজস্ব এক সম্ভাবনাময় জগতকে সাদরে অভিনন্দন জানিয়ে গ্রহন করার এক আপ্রাণ চেষ্টা বা প্রয়াস তাতে কোন সন্দেহ নেই।

চরণদাসী

প্রথম প্রকাশের স্থানকাল অজ্ঞাত, পাকাল গ্রন্থে গল্পটি স্থান পায় ৩রা অগ্রাহায়ন ১৯৮৩ খ্রি:

'চরণদাসী' গ্রন্থেও মহাশ্বেতা দেবী নারীর প্রতি অন্যায় অত্যাচারের রূপটিকেই তুলে ধরেছেন। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রাজনীতিকে হাতিয়ার বানিয়ে পুরুষতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার গোড়ামি এবং নারীর প্রতি হওয়া অন্যায় ও অত্যাচারের দিকটিকেই উল্লেখ করেছেন। ধর্মীয় কুসংস্কারকে কাজে লাগিয়ে নারীর শরীর, মন এবং জীবনকে পুরোপুরি ভোগ করার জন্য ঈশ্বরের পুজারী সাধারণ নিম্ন অন্ত্যজ শ্রেণির মেয়েদের নিজেদের আয়ত্বে নিয়ে আসে। অথচ সাধারণ মানুষকে ঈশ্বরের দাসী বলে সান্ত্বনা দেয়। যা ভেবে সাধারণ মানুষ নীরবে সব সহ্য করবে এবং মেনে নেবে। ঈশ্বরের নামে সাধারণ গ্রাম্য অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের মনে ভয় ঢুকিয়ে দেয়। এবং ঈশ্বরের সম্পর্কে কিছু আধ্যাত্মিক কথা শুনিয়ে গরীব অভাবি মেয়েদেরকে ঈশ্বরের মুর্তির সঙ্গে মালা বদল করিয়ে বিয়ে দেওয়া হয়। ঈশ্বরের পাদপদ্যে নিবেদিত একটি টাকার মালা বাঁনিয়ে মেয়ের গলায় পরিয়ে দিলে সে ঈশ্বরের অর্থাৎ ভগবানের স্ত্রী হয়ে যায়। আর স্ত্রী মানেই যার স্থান চরণের নিচে অর্থাৎ চরণ সেবার জন্য যে মেয়ে রাখা হয় সে হয় চরণদাসী। অপরদিকে ঈশ্বরের মন্দিরের নামে গরু ছাগল যা কিছু থাকে তার দেখা শুনা করার জন্য যে লোকের প্রয়োজন হয়, ঘাস কাটা, গোবর ফেলা, স্নান করানো, ঠাকুরের ফুল তোলা, মালা গাথা, কাপড় কাচা প্রভৃতি

কাজ গুলো করে নেওয়া হয় চরণদাসীদের দ্বারা। আর এখানেই চরণদাসী গল্পের মূল বিষয়। তবে এই গল্পে দেখা যায় মেয়েরা চরণদাসী হিসেবে অর্থাৎ ঈশ্বরের বা ভগবানের স্ত্রী হিসেবে রক্ষিত হলেও পরবর্তী সময়ে এই চরণদাসীদেরকে মন্দিরের পূজারীরা বেশ্যাবৃত্তিতে পরিনত করে।

আলোচ্য গল্পে প্রতাপচাঁদ নামের একজন ক্ষমতা ধর উচ্চ শ্রেণির মানুষের মৃত্যু ঘটে। এই প্রতাপ চাঁদের স্মৃতি রক্ষার্থে তাঁর ছেলে এক বিশাল মুরলি মনোহরের ও রাধিকার মন্দির নির্মান করে। আর এই মন্দিরের গোস্বামী হলেন চরণদাস। তিনি একজন বিখ্যাত মানুষ কেননা তার জন্ম বর্ধমানে, সাধনা হিমালয়ে, আর কর্ম হচ্ছে দক্ষিন ভারতে। এই বিখ্যাত মানুষটিই 'চরণদাসী' প্রথার প্রবর্তন করেন। ওড়িয়া পরিবারের মেয়ে মালিকা দীপ তার বাবার সঙ্গে চলে আসেন চরণদাসের মন্দিরে। কারণ মেয়ের বিয়ের জন্য প্রতাপ নগরের এক সু-পাত্রের সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা করতে চলে আসেন মালিকার বাবা। কিন্তু বিয়ের বাবদ সুপাত্র যা পণ চায় তা দেওয়া মালিকার বাবার সধ্যের বাইরে যার ফলেই নিরুপায় হয়েই ঝড় জলের রাতে চরণদাসের প্রস্তাবে মন্দিরে ঠাকুরের স্ত্রী হয় মালিকা। মালা বদল করে চরণদাসীতে পরিনত হয়। আশ্চর্যের বিষয় চরণদাসকে ঠাকুর স্বপ্নেই মালিকাকে চরণদাসী বানানোর কথা বলেছেন।

এখানেই পুরুষতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সাংস্কৃতিক রাজনীতি এতটাই সুকৌশলে এবং সুক্ষ্মভাবে মালিকার উপরে বর্তায়, মালিকা নিজে তো বাল্য তাই বুঝতে পারেনি কিন্তু তার পিতাও বিন্দুমাত্র বুঝতে পারেনি। আসলে এখানে রয়েছে পুরুষতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার কৌশল। মালিকার বিয়ের পাত্র বিয়ের যথাযোগ্য পণ পায়নি বলে বিয়ে করেনি। আবার চরণদাসের শুধু শরীরের প্রয়োজন থাকায় মালিকাকে চরণদাসী বানিয়ে নেয়। এখানে পুরোটাই পুরুষতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার স্বার্থপরতার দিকটিকেই নির্দেশ করেছে। যার মধ্যদিয়ে গোটা নারী জাতিটাকেই শোষণ করেছে সমাজ। কেননা বিয়ের পাত্রটি একই সঙ্গে দুটো কাজ করে নেয়, বিয়ে এবং টাকা উভয়ই একই সঙ্গে পেয়ে যায়। নারী, পুরুষের

কাছে পন্য হিসেবেই পরিগনিত হয় এই স্থানে। আবার চরণদাস মালিকাকে দেবতার স্ত্রী বানানোর মধ্যদিয়ে মন্দিরের নামে জমি কিনে সেই জমি চরণদাসের নামে রাখতে পারবে আবার মন্দিরের কাজ কর্ম, জমির ক্ষেতির কাজ সবই করতে পারবে। আর এই মন্দিরের নামে ক্রয় করা টাকা চরণদাস ও মস্তান, জোতদার, ক্ষমতাধারী মানুষেরা নিজেরা ভোগ করে।

এই চরণদাস জীবিত থাকতে চরণদাসী শারীরিক দিক থেকে অক্ষুন্ন ছিল কিন্তু তার মৃত্যুরপর শীর্ষ গুরুচরণ দাস হয়ে ওঠে ওই মন্দিরের নতুন চরণ দাস। সে হাজার হাজার নতুন চরণদাসী নিয়োগ করে। গুরুর মৃত্যুরপর প্রথম রাতেই সময় নষ্ট না করে মালিকাকে নিয়ে আসে নিজের ঘরে। এখন সে নতুন গুরু চরণদাসের চরণদাসী। এই চরণদাসীদের নিজস্ব ব্যক্তি মর্যাদা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা বলে কিছু থাকে না, তারা সব অর্থেই মন্দিরের সম্পত্তি

> "নতুন চরনদাস মন্দির থেকে দূরে চরণদাসীদের জন্য সার সার ঘর তুলে দেয়। মালিকাকে সে নিজে রাখে কিছুদিন, তারপর বছর ছ'য়েক বাদে মালিকার নির্বাসন হয় বারোয়ারী ঘরে।.....
>
> এখন তুলসী যায় তার জায়গায় আর মুলুকচাঁদের ঠিকাদার, দালাল, খাদানের অবার সিয়াররা আসতে থাকে চরণদাসীদের ঘরে। এখনকার প্রত্যেক চরণদাসীর ঘরে একটি করে কৌটা রেখে দেয়। পয়সা কৌটোর ফুটোয় ফেল। চরণদাসীটি তোমার পয়সাটি মন্দিরের। মেয়েদের ইহকাল পরকালের স্বামী যিনি এ তারই ইচ্ছা। তিনি তোমাদের গোলায় মালা দিচ্ছেন, তোমাদেরও উচিৎ তার দেওয়া দেহ দিয়ে তার কাজে লাগা।

মালিকা সবই শোনে সবই দেখে। ঠাকুরের কৃপায় তার দেহে এখন গর্ভের সকল প্রকার লক্ষণ প্রকাশ পায়।”[২৭]

মন্দিরের নামে, দেবতার নামে, নারী নির্যাতনের রূপ চরমতম পর্যায়ে পৌঁচ্ছায়। অন্য চরণদাসীর যা হয়নি মালিকার তাই হয়েছে। মালিকা গুরুচরণ দাসের সন্তানের মা হয়েছে অথচ এ ঈশ্বরের দান যার ফলে মাথা পেতে সবকিছু সহ্য করতে হবে মালিকা কে। এবারে সে চরণদাসের সন্তানকে কোলে নিয়ে যখন চরণদাসের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় তখন চরণদাস মালিকার হাতে ধরিয়ে দেয় একটি কৌটা। এবারে সে ছেলে কোলে নিয়ে মন্দিরের সামনে নয় তো গ্রামে গঞ্জে ভিক্ষে করে বেড়াবে, আর এই ভিক্ষের টাকা মন্দিরের দেবতার।

সহ্য করতে পারেনি চরণদাসী। প্রতিবাদ করেনি বটে কিন্তু রেল লাইনে চরণদাসের সন্তান সহ নিজেও ঝাপ দেয় মাল গাড়ির নিচে। এভাবেই চরণদাসীর নিজস্ব জীবন নিজেই শেষ করে ফেলে। ঈশ্বরের নাম করে তার উপর হওয়া সমস্ত অন্যায় ও অপমানকে সে নিজের প্রান দিয়ে মুছে ফেলে।

চরণদাসী মালিকা মরে যায় ঠিকই কিন্তু সচেতন করে যায় তার পরবর্তী প্রজন্মের সমস্ত অসহায় দরিদ্র মেয়েদের। কেননা এক চরণদাস মরে গেলে যেমন দলে দলে চরণদাস গজিয়ে ওঠে। আর প্রতি বছর বেড়ে যায় চরণদাসীর সংখ্যা।এর মূল কারণ গ্রামের মানুষ জমি নির্ভর, আর সমস্ত জমি হল মন্দিরের সুতরাং মন্দিরের জমি চাষবাস করে খেয়ে বেঁচে থাকলে মেয়েকে চরণদাসী বানাতেই হবে। এই চরণদাসী বানানোটা বাধ্যতা মূলক। মেয়েরা যদিও চরণদাসী হতে না চায় তবে বাবা-মা জোর করে বলপূর্বক চরণদাসী বানিয়ে দিবে। মালিকা যেখানে ব্যর্থ নিজে পারেনি নিজেকে রক্ষা করতে তার জায়গায় সোনা নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছে। সে হয়ে উঠেছে এই চরণদাসী প্রথার

বিরোধী এক বিদ্রোহী নারী। দিলিপের মতোন কিছু মানুষ এই চরণদাসদের রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন হয়। এরাই প্রথম এই ঈশ্বর বিরোধী কাজে হস্থক্ষেপ করে এবং এদের সহায়তায় সমস্ত দাসী চরণদাসদের হাত থেকে মুক্তি লাভ করে। সোনা চরণদাসী হওয়ার পরিবর্তে মৃত্যু বরণ করতে চায় তাকে রক্ষা করে রহিনী। রহিনী তাকে টাকা পয়সা দিয়ে ভাগিয়ে দেয়। এ আসলে এক নারীর প্রতি অন্য আর এক নারীর টান। এই রোহিনী দেখেছে এবং বুঝেছে চরণদাসীদের নির্যাতন, করুন পরিনতি ও তাদের বার্ধক্য জনিত অবস্থা গুলি।

প্রকৃত পক্ষে মহাশ্বেতা দেবী হিন্দু ধর্মের ধর্মীয় কিছু গোড়ামীর দ্বারা নারী শোষণের দিকটিকেই বাস্তবতার মধ্যদিয়ে ফুঁটিয়ে তুলেছেন। দেখিয়ে দিয়েছেন নারী শোষনের ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা গুলিকে। কত রকম কৌশলে যে নারীকে নির্যাতিত করা হয় ক্ষমতা বা প্রতাপের দ্বারা সেই দিক গুলিকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। পাশাপাশি এটাও বলে দিয়েছেন যে নারীকে শোষনের ও শাসনের মাত্রা যতটাই তীব্র ও প্রখর হোকনা কেন, রাষ্ট্র শক্তি, পুলিশ প্রশাসন, ধর্মীয় বিধি–বিধান যতটাই নারী বিধ্বংসী হোক না কেন। নারী তার ব্যক্তি মর্যাদা নিয়ে কোন না কোন সময় স্বশরীরে প্রতিবাদী হয়ে উঠবে এবং নিজস্ব স্বতন্ত্র এক সম্ভাবনাময় জগৎকে তৈরি করবে। এই বার্তাই ‘চরণদাসী’ গল্পের মধ্যদিয়ে মহাশ্বেতা দেবী সমস্ত চরণদাসীদের জীবন পরিনতি এবং নবাগত চরণদাসীর আসনে আসা নারীদের মধ্যদিয়ে নীরবে অথচ প্রত্যক্ষ ভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন সে বিষয়ে কোন সংশয় নেই।

সীমান্ত

প্রথম প্রকাশ : 'শারদীয় প্রসাদ' ১৩৯০ / ১৯৮৩ খ্রি:

'সীমান্ত' গল্পে মহাশ্বেতা ময়নামতী নামক একটি মেয়ের জীবন কাহিনিকে প্রধান্য দিয়েছেন। দেখিয়ে দিয়েছেন সমাজের রাজনৈতিক চিত্রের বিধ্বংসী রূপ এবং পুরুষতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার কড়াকরি নিয়মাবলীর কঠোরতা এই নিয়ম এতটা গভীর হয় যে নিজের কন্যা সন্তানের পিতা পর্যন্ত কন্যার পরিশ্রমকে শোষণ ও শাসন করতে দ্বিধাবোধ করে না। তবে পুরুষতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পুরোপুরি বাইরে এসে ব্যক্তি স্বাতন্ত্রে উজ্জ্বল এক মর্যাদা সম্পন্ন স্থান তৈরি করে ময়না মতির প্রতিবাদী মন।

গল্পে ময়নামতির বাবা দুশ্চরিত্রবান এক ঠক, জোচ্চোর, স্ত্রী কন্যাকে শোষনকারী এক রক্ত চোষা মানুষ। নির্বিঘ্নে অন্যায় ও অত্যাচার করে স্ত্রী কন্যার উপর যখন তখন যেমন তেমন বিষয়ের উপরে চটে যায় ও ঠেঙায় নিজের কন্যা ও স্ত্রীকে। সে মদ খায় স্ত্রী

কন্যার উপার্জনের টাকায়। ময়না মতির মা রানি কয়েকটা বাড়িতে ঝি-য়ের কাজ করে সংসার চালায়। আবার ময়নামতি একটু বড় হলে সেও মানুষের বাড়ি বাড়ি ঝি-য়ের কাজ করে অথচ ময়নামতির পিতা সুবুদ্ধি মিদ্যা,

> "যখন জেলে থাকত না তখন ওর বউ মেয়েদের ঠেঙাত। এটা পাল পাড়ার লোক মেনেই নিয়েছিল। দশ বছর আগে চোলাই কারবার এমন অবাধ মদত পায় নি, যাতে ওঠেনি। মাঝে মাঝে লোক দেখানো হানা দিত পুলিশ, ধরা পাকর। সুবুদ্ধি বার বার ধরা পরত।"[২৮]

ফলে গোটা পরিবারের দায়িত্ব এসে পরত ময়না ও তার মা রানীর উপর। ময়না ওর দুটি বোনকে দু বাড়িতে খাওয়া পরার বিনিময়ে কাজে লাগিয়ে দিয়েছে। মেয়ে বউ সবাই রোজগার করে আর সুবুদ্ধির মনের ভাবনা হয় এখন ওর সুখের দিন। কিন্তু বাদ সাজে ময়না। সে তার উপার্জনের একটি পয়সাও বাবাকে মদ ভাঙ খেতে দিবেনা। কারণ স্বাভাবিক ভাবে বড় বোন হওয়ায় তার ছোট দুটি বোনের বিয়ের এবং তাদের মানুষ করবার দায়িত্ব নিজের ঘারে এসে পরে, তাইতো সমাজের অন্যান্য মেয়েদের মতো নিজের উপার্জনের টাকা তার বাবাকে দেবে না। গরীব নিম্নশ্রেণির মানুষের পরিবারের মেয়ের এটা একটা বড় ধরনের বাড়াবাড়ি। কিন্তু ময়নার প্রতিবাদ অনবরত চলতে থাকে পিতা সুবুদ্ধির বিরুদ্ধে। কন্যা বিরূপ হওয়ায় সুবুদ্ধি দু:খ করে বলে,

> "ইশশ্! ময়নারে! কত ত্যাগ করেছি তোদের দিকে চেয়ে ঘরে ঘরে এখন বাবরা টাকা নিচ্ছে মোটা, বিহারীদের কাছে মেয়ে বিয়ে দিচ্ছে।আমি তো সে কাজ করতে পারতাম করেছি?"[২৯]

বিয়ের নাম করে বিহারে মেয়েদের বিক্রি করে দেওয়ার প্রচলন এখনও আছে সুবুদ্ধিও মেয়েকে বিক্রি করে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু জেলে পরে যায় ফলে মেয়ে কে বিক্রি করা আর হয় না। এই বিক্রি করতে না পারাটাই সুবুদ্ধির মতো পিতার কাছে একটা বড় ধরনের ত্যাগ। বজ্জাত, বদমাস, স্বার্থপর মানুষের মনের মূল অভিপ্রায় তার অবচেতনে যে প্রকাশ করেছেন সুবুদ্ধি তা পাঠকবর্গের আর বুঝতে বাকি থাকে না। তাছাড়া গোটা সমাজ ব্যবস্থাটাই যে নারীকে পন্য হিসেবেই ভাবে তা সুবুদ্ধির মধ্যদিয়ে মহাশ্বেতা জানিয়ে দিয়েছেন। তবে গোটা সমাজ ব্যবস্থার প্রথাগত নিয়ম নীতির বাইরে গিয়ে পরিপূর্ণভাবে ময়না মতি প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ জানায়। প্রতিবাদ জানায় তার বাবার মদ্যপানের বিরুদ্ধে। সে গর্জে ওঠে এবং অসৎ পিতার মুখের উপর বলেদেয়,

> "বলেছি মাকে, তোমাকে বলছি। গোপলাদের বলে রেখেছি যে, তুমি মদ খেতে গিয়েছ দেখলেই তোমাকে রাম ঠেঙান ঠেঙাবে।
>
> আমাকে।
>
> হ্যাঁ। নয়তো তোমাকে কেটে আমি জেলে যাব।
>
> এখানেই থামে না ময়না। তিনদিন বাদে বলে, আজ থেকে তুমি রোজগারে বেরবে। চাল বাও, বাদাম বেচ, যে কোন ধান্দা কর, রোজগারে বেরবে।"[৩০]

এভাবেই ময়না ও তার বাবার মধ্যে বিরোধ সৃস্টি হয়। ময়নার প্রতিবাদ শুধুই বাবা আর মেয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। ময়না যেন গোটা সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে বসবাসকারী সমস্ত দুশ্চরিত্র ঠক, জোচ্চোর, মদারু এবং মেয়েকে বিক্রি করা ও স্ত্রী কন্যাকে শোষণ করা সমস্ত পুরুষের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করে। বাবার সাহায্য ছারাই ময়না তার ছোট দুই বোনের বিয়ে দেয়, বাবা ছাড়া বিয়ে হয় না, চিরা চরিত এই প্রথাকে ভেঙেদেয় ময়না। ময়না এখানে যেন সত্য ন্যায়নিষ্ট বাস্তবতার প্রতীক। সে উপার্জন হীন বজ্জাত দুশ্চরিত্রবান

পিতাকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে। শৃঙ্খলানুসারে দুই বোনের বিয়ে দেয় অভিভাবক হয়ে নিজের উপার্জনের টাকায়। তাতেও বাদ সাধে তার বাবা সুবুদ্ধি। বিয়ে হয়ে যাবার পর ময়নার মাকে বলে, 'তোমার ঐ মেয়ের বিষ দাঁত আমি ভাঙব একদিন।' কিন্তু পিতার ধমকানি ময়নার গায় লাগে না, ভয়ও পায় না। প্রতিটি বিষয়ে নিজের সাধ্য মতো প্রতিবাদ করে যায় ময়না। বোনের বিয়ের পাত্রের ব্যাপারে ময়না সোজা সাপটা কথা বলে দেয়,

> "আমার সোজা কথা, এখন সস্তার ঘরি, সস্তার রেডিও মেলে, তাই দেব। বরযাত্রী দশ জনের বেশি হলে পারব না। আর দান সামগ্রী ! ছেলেরও তো নিজের রিকসা অব্দি নেই, আপনার ভিটেই বাস।"[৩১]

ঋজু ভাষায় ও কথায় শুধুমাত্র সামান্য দান সামগ্রিতেই বিয়ে দেয় ময়না। বর কর্তৃপক্ষের আর কিছু বলার রাস্তা থাকে না। ময়না শুধুমাত্র নিজের গরীবানার অসহায়তার কথাই স্বীকার করে না পাশাপাশি পাত্রের যোগ্যতা এবং পন প্রথার কঠিন বেরাজালকেও লঙ্ঘন করে কিছুটা।

ময়নার পিতা সুবুদ্ধি যখন অপরের দুইশ টাকা হাতিয়ে নেয় এবং সুবুদ্ধিকে লোকে গলায় গামছা বেঁধে ঘোড়ায় তখনও এই ময়নাই তার বাবকে বাঁচায় সমস্ত মানুষের মারের হাত থেকে। এই স্থানে ময়নার উপস্থিত বুদ্ধি এবং ঘটনার সমঝোতার মাধ্যমে ইতি টানার কৌশলটি প্রকাশিত হয়।

> "ময়না ঝন করে দরজা খোলে সকলকে দেখিয়ে একটি লোহা হাত থেকে ফেলে। ফুলি ও দুলির বিয়ের সময়ে পড়শি বউরা ওকে সিঁদুর পরিয়ে ছিল।.....

চুল উল্টানোই ছিল। মাথা ঝাকিয়ে চুল খুলে ময়নামতি আঁচলের কোনা দিয়ে সিঁদুর মুছে। তারপর বাবকে বলে, টাকা কোথায় রেখেছ বের করে দাও।

যুবকটিকে বলে, এই লোকটা ফের আপনাদের ঘরে গেলে মেরে ঠেং ভেঙে দিবেন। .....

ময়নামতি জনতার মধ্যদিয়ে দুম দুম করে বেরিয়ে যায়। এভাবেই ঘটনাটির পরিসমাপ্তি ঘটে।"[৩২]

ময়না যেন সাক্ষাৎ গোখরে সাপ, কেউ একটু ছুলেই ছোবল দিবে। তাই তো যে অশোক নগরে নারীর ইজ্জতের রক্ষার লড়াই চলে সেই অঞ্চলেরও কেউ ওর গায়ে হাত দেওয়ার বা কোন রকম খারাব ঈঙ্গিত করার সাহস পায় না। প্রকৃত অর্থে ময়নামতি নিজের ঈজ্জতকে বাঁচিয়ে রাখতে শিখেছে। ময়না নিজে বিয়ে করেনি। দালালের কাছ থেকে মোটা টাকা নিয়ে ময়নাকে বিয়ে দেওয়ার নামে বিক্রি করার জন্য উঠে পরে লাগে সুবুদ্ধি, গুন্ডা লাগিয়ে দেয় ময়নার সেই ট্রেনে ভিক্ষে করার সঙ্গী ছালেমকে মারার জন্য। এবারে ময়না ছালেমকে নিয়ে গোটা এলাকা থেকেই পালিয়ে যায় কলকাতার ফুটপাতে, রেল স্টেশনে। যেখানে নিষেধ নেই, বাধা নেই, বিপত্তি নেই সেখানে। ময়না ছালেম কে নিয়ে সমস্ত বাধা নিষেদের সীমান্তকে পেরিয়ে চলে যায়। তার সমস্ত দায়িত্ব সম্পন্ন হয়েছে। ছোট দুটি বোনকে বিয়ে দিয়েছে। এবার তার নিজের জীবনকে কিভাবে অতিবাহিত করবে সে চিন্তায় সে মগ্ন।

এখানেও ময়না যেন শুধু তার বাবার বিরুদ্ধেই নয় গোটা সমাজের এবং সমস্ত শক্তিমান গুন্ডা সম্প্রদায়ের বাইরে চলেগিয়ে প্রমান করে দেয় যে ময়নাও রক্তে মাংসে গড়া মানুষ, তারও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র বোধ আছে, মর্যাদা আছে। তাইতো মর্যাদা হীন সমাজে সে বসবাস করবে না সে জন্যই পালিয়ে যায়। এবং তার নিজস্ব স্বতন্ত্র এক নতুন সমাজ যেন

সে নিজেই তৈরি করে নেয়। এখানেই ময়নার বিদ্রোহের মূল স্বরূপ। এবং সমস্ত নারী সমাজের এক নতুন সম্ভাবনাময় অবস্থান নির্মানের প্রচেষ্ঠা যা পরিপূর্ণভাবেই পুরুষতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার শোষণ, শাসন ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে এবং ব্যক্তি স্বাধীনতায় নারী পুরুষের সমমর্যাদা বেরেছে।

তথ্যসূত্র

১. মহাশ্বেতা দেবীর রচনা সমগ্র, ৮ম খন্ড, সম্পা: অজয় গুপ্ত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ-৪১৭

২. তদেব, পৃ-৪১৮

৩. তদেব, পৃ-৪১৬

৪. তদেব, পৃ-৪১৫

৫. মহাশ্বেতা দেবীর রচনা সমগ্র, ১৭ নং খন্ড, সম্পা: অজয় গুপ্ত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ-৩৮২

৬. তদেব, পৃ-৩৮২

৭. তদেব, পৃ-৮.৩৮৩

৮. তদেব, পৃ-৩৮৪

৯. তদেব, পৃ-৩৯১

১০. মহাশ্বেতা দেবীর রচনা সমগ্র, ১৫তম খন্ড, সম্পা: অজয় গুপ্ত, দে'জ পাবলিশিং, পৃ-৪১৩

১১. তদেব, পৃ-৪১৫

১২. তদেব, পৃ-৪১৫/৪১৬

১৩. তদেব, পৃ-৪১৬

১৪. তদেব, পৃ-৪১৭

১৫. তদেব, পৃ-৪২১

১৬. তদেব, পৃ-৪২৪

১৭. তদেব, পৃ-৪৭৪

১৮. তদেব, পৃ-৪৭৪

১৯. তদেব, পৃ-৪৭৮

২০. তদেব, পৃ-৪৮৩

২১. তদেব, পৃ-৪৯০/৪৯১

২২. মহাশ্বেতা দেবীর রচনা সমগ্র, ১১তম খন্ড, সম্পা: অজয় গুপ্ত, দে'জ পাবলিশিং,

কলকাতা পৃ-২৯৮

২৩. তদেব, পৃ-৩০৮

২৪. তদেব, পৃ-৩১৬

২৫. মহাশ্বেতা দেবীর রচনা সমগ্র, ৫ম খন্ড, সম্পা: অজয় গুপ্ত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ-৪৪৮

২৬. তদেব, পৃ-৪৪৮

২৭. মহাশ্বেতা দেবীর রচনা সমগ্র, ১২তম খন্ড, সম্পা: অজয় গুপ্ত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ-৩০৪

২৮. তদেব, পৃ-৪১৩

২৯. তদেব, পৃ-৪১৪

৩০. তদেব, পৃ-৪১৭

৩১. তদেব, পৃ-৪১৮

৩২. তদেব, পৃ-৪২৪

সপ্তম অধ্যায়

মহাশ্বেতার আখ্যান বিশ্বে রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তব, নারীর প্রতিবাদিনী সত্তার তাৎপর্য